হিন্দু না মুসলিম?

[সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব ব্যাখ্যা]

সুশীল কুমার বসু

'আজ ও আগামীকাল' সিরিজ

সমবায় পাব্‌লিশার্স

কলিকাতা

হিন্দু না মুসলিম ?

জানুয়ারী ১৯৪৩



মূল্য দুই টাকা আট আনা মাত্র

সমবায় পাব্‌লিশার্স, ৩৩।২ শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা : মহাদেব সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ভিক্টরী কোম্পানি, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা : হরিপদ দাশ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মৌলভী সৈয়দ নওশের আলি সাহেবের

করে—

শ্রদ্ধাভরে অর্পিত হইল

নিবেদন

বহুর মধ্যে এক, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য সূত্রের সন্ধান ভারতীয় চিন্তা-ধারায় নূতন কথা নহে। তবু এই ভারতেই আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জাতীয় মুক্তিকামনা পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কোন পারিপার্শ্বিকের প্রশ্রয়ে ইহা এতটা পরিপুষ্টি লাভ করিল? গ্রন্থকার সুশীল কুমার বসু মহাশয় নিরপেক্ষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই করুণ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র।

'সাম্প্রদায়িকতা' বলিতে ধর্ম্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাই আমাদের মূল সমস্যা, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থের মুখ্যত তাহাই আলোচ্য বিষয়,—একথা স্মরণ রাখিলে লেখকের বিচারভঙ্গী অধিকতর সহজ অনুধাবনীয় হইবে।

এক বৃহত্তর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বহু জাতির একত্রে বসবাস, একরাষ্ট্রাশ্রয়ী জীবননিয়ন্ত্রণ, কিছু কষ্টকল্পনার দৃষ্টান্ত নয়। ইতিহাসাগত জীবনধারা, জাতীয় উত্থান-পতন, সভ্যতা-সংস্কৃতির সিদ্ধি—এবং বর্ত্তমানের রাষ্ট্রিক-অর্থনীতিক ব্যবস্থা, সর্ব্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন—ইত্যাদি বিষয় ভারতবর্ষের জাতীয়তাকে একটা সমগ্রতা দান করিয়াছে সত্য; অপরপক্ষে ভারতবর্ষ-যে আভ্যন্তরীক বহু জাতি-উপজাতির আবাসভূমি—একথাও অনস্বীকার্য্য। আজ ঐ সমস্ত বিভিন্ন জাতির মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বার্থের মাঝেই মহা-ভারতের মহা-জাতীয়তার অধুনাতম পূর্ণরূপ অন্বেষণ করিতে হইবে।

একই ভাষা, ভৌগোলিক সংস্থান, অর্থনীতিক অবস্থা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের সমন্বয়ে যে লোকসমষ্টি এক—তাহাদিগকে এক-

জাতি বলা যায়। অনুরূপ সংজ্ঞানুসারী জাতিভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা অন্যান্য স্বাধীন বৃহৎ রাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের দেশেও আছে—তাহার স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণের দাবী পেশ করা বা পূরণ করা পেশকারী বা পূরণকারী কোনো পক্ষেরই অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নয়; পরন্তু, তাহা প্রকৃত গণরাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও উন্নততর সভ্যতারই অনুপন্থী, কার্য্যকরী বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রভাবে ও প্রেরণায় ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, শ্রেণী, জাতি, উপজাতি সকলের মধ্যেই স্বনিয়ন্ত্রণের স্পৃহা, স্বার্থচেতনা ও সম্মানজ্ঞান অল্পবিস্তর প্রসারলাভ করিয়াছে। এই স্বার্থচেতনা তথা স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা তৃতীয়পক্ষের পরোক্ষ-প্ররোচনায় ও স্বার্থদুষ্টশ্রেণী বা অদূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন পথে চালিত হইতেছে ; প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নভাবে — এবং সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সমগ্রভাবে—পঙ্গু হইতেছে। আত্মচেতী জনসাধারণ এই অতিবাস্তব বিষয়টির প্রতি অবহিত থাকিলে কোনো 'লীগ' বা 'মহাসভা' ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতার আচ্ছাদনে জাতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থসংরক্ষণের দাবী পেশ করিবে না ; এবং কোনো 'মহাত্মা' বা 'কংগ্রেসের' পক্ষে অখণ্ড বৃহত্তর জাতীয়ভার অজুহাতে ন্যায্য জাতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থসংরক্ষণের সাম্প্রদায়িক দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইবে না।

—এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নমাত্রকেই জটিল বা কুটিল ভাবিবার অবকাশ থাকিবে না ; এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবীমাত্রকেই জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী মনে করিবার অথবা সংখ্যালঘুর স্বার্থসংরক্ষণ-প্রচেষ্টাকে অন্যায় আব্দার হিসাবে বিচার করিবার কোনো কারণই থাকিবে না। এই দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইলে লীগ ও কংগ্রেসের

মিলন কিছুমাত্র অসম্ভব নয় ; পূর্ব্বে যাহার যে রূপই থাক, বর্ত্তমানে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণপ্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইতে মনে হয় অচীরেই এই মিলন হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের সম্মুখে এই মিলন আরও অবিলম্বে একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে কোনো মূল্যে এই মিলন আজ প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। সুশীল বাবুর এই গ্রন্থ জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে নূতন রূপদানে সাহায্য করিবে ; সেই বহু-অভিপ্সীত মিলনের পথে নূতন বাস্তব দৃষ্টিশক্তিই একমাত্র পাথেয়।

আশা করি, দেশবাসীর আছে, বিশেষ করিয়া অগ্রগামী সকল দলের কর্ম্মী ও চিন্তাশীল পাঠকসমাজে 'হিন্দু না মুসলিম ?' উপযুক্ত বিচারলাভে সমর্থ হইবে।

— প্রকাশক

সূচী

প্রথম অধ্যায়

জনসাধারণের স্বার্থ—পরস্পর বিরোধী নহে

আমাদের রাজনীতিক এবং সামাজিক জীবনের যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক, সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণপ্রাচীরের মতো সাম্প্রদায়িক সমস্যা আমাদের অগ্রগতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলিতে এদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই বুঝায়। গুরুত্বে ও জটিলতায় আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সমাধানের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

সামান্য গ্রামোন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন পর্য্যন্ত আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রচেষ্টা সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে খণ্ডিত ও বিফল হইয়া যাইতেছে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বহুবিধ সমস্যার নিত্য আবির্ভাব ঘটিতেছে। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের মধ্যে যে আগ্রহাতিশয্য আছে, তাহা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাতে পথের সন্ধান মিলিতেছে না।

ত্বরিত মীমাংসার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া অনেক সময় আমরা সহজ ও সস্তা প্রতীকারের সন্ধান করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে সমস্যার জটিলতা আরও বাড়িয়াই যাইতেছে মাত্র। সাম্প্রদায়িকতাকে যাহারা বাঁচাইয়া রাখিতে চায় আমাদের মনের এই দুর্ব্বলতাকে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা কাজে লাগাইতেছে। সস্তা কোনো প্রতীকারের আশ্বাস দিয়া মিটমাটের কথা পাড়িয়া ইহারা দেশবাসীর মনে আশা জাগায় এবং কৌশলে নিজেরাই তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া দেশের মধ্যে গভীর নৈরাশ্য লইয়া আসে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কাছে যাহাদের মন পরাভব স্বীকার করে নাই এমন লোকেরাও এই সমস্ত ব্যাপারের পর মনে করিতে থাকে যে, আর মীমাংসার আশা করা মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার পথে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত কাহারও পক্ষেই বুঝি আর গত্যন্তর নাই। এই সমস্ত মীমাংসার চেষ্টার সময় যে-সমস্ত দাবী, পাল্টা দাবী, উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রভৃতির উদ্ভব হয় তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তাহা সাম্প্রদায়িকতাকে নূতন শক্তি ও জীবন দান করে। উভয় পক্ষেরই আলোচনারত লোকেরাই নানা সাম্প্রদায়িক উক্তি করেন এবং তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ক্ষোভ ও তীব্রতা অনেক বাড়িয়া যায়। সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখা যাহাদের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন তাহাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ দুইই সিদ্ধ হয়।

কিন্তু সমস্যা দুরূহ বলিয়া এবং সমাধানের জন্য এতাবৎ অনুসৃত নীতি ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইয়া আমাদের হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া নূতন পথের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং তাহার জন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত স্বরূপ কী, তাহার মূল কোথায় তাহা জানিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে তাহার অসারতা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং জনসাধারণের

কাছে এই সমস্ত কথা পৌঁছিয়া দিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের প্রকৃত রূপটা যদি লোকের জানা থাকিত, কাহাদের স্বার্থে কাহারা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায় তাহা যদি সবাই—অন্ততঃ বহুলোকে জানিত তাহা হইলে অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন ঘটিত। যেসব বড় বড় বুলির আড়ালে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকারে সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করা হয় এবং যাহার ফলে জনসাধারণ সাম্প্রদায়িকতার অনুকূলে প্রভাবিত হয়, জনসাধারণের সমক্ষে তাহার অসারতাকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ও প্রতিপত্তি যে অনেক কমিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটির ভিত্তি কোথায়, কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল আর কিসের আশ্রয়েই-বা ইহা বাঁচিয়া আছে? যদি আমরা জনসাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থের মধ্যে কোনো সংঘাত নাই। একই কারণ হইতে উদ্ভূত দারিদ্র্যে উভয়েই নিষ্পেষিত হইতেছে; একই শোষণ-ব্যবস্থার ফলে উভয়েই নিঃস্ব ও সর্ব্বহারা হইতেছে; এবং একই প্রকার পরিবর্ত্তনের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ সমভাবেই লাভবানও হইবে। হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থের ধ্বনি যে কতটা মিথ্যা ও ভুয়া তাহা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বার্থের কথা পৃথকভাবে বিবেচনা করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহাদের কথা যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকেরই দুঃখ দুর্দ্দশা এক প্রকারের, এবং ইহাদের স্বার্থের মধ্যেও কোনো ব্যবধান নাই। যেসব কারণে হিন্দু

কৃষকের দুর্দ্দশা, মুসলমান কৃষকের দুর্দ্দশাও সেই একই কারণে ঘটিয়াছে। যেসব অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আইন হিন্দু কৃষকদের নিঃস্ব করিয়াছে সেই সব আইনেই মুসলমান কৃষকদেরও স্বার্থহানি হইয়াছে। একই রকম জুলুম ও অত্যাচার দুই সম্প্রদায়ের কৃষকদেরই ভোগ করিতে হয়। অন্যায় ভূমি-ব্যবস্থার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক সমভাবে নিরন্ন ও ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা একই হারে বাড়িয়া যাইতেছে। অনেক জমি অকৃষকদের হাতে সঞ্চিত হওয়ায় কৃষকদের জমির পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কারখানা শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্পের ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহাতে কর্ম্মচ্যুত লোকেরা কৃষির দিকে ঝুঁকিতে বাধ্য হইয়াছে ; অথচ, কারখানা-শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় জমির উপর চাপ কমিবার কোনো পথ নাই। কাজেই. কৃষকদের ভূমিহীনতার প্রশ্ন খুবই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে এবং মাথা পিছু জমির পরিমাণ অত্যল্প হইয়া যাওয়ায় কৃষকদের আয় প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকিয়াছে। কিন্তু, এই দুর্দ্দৈব হিন্দু বা মুসলমান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কৃষকের প্রতি পক্ষপাত করে নাই, উভয়কেই সমভাবে পীড়ন করিতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকের মধ্যেই ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারা সমগ্র সমাজ-দেহের উপর ভার স্বরূপ চাপিয়া রহিয়াছে। যাহাদের জমি আছে তাহাদেরও জমি একান্তই অপর্য্যাপ্ত ; সুতরাং বেশীর ভাগ কৃষকই আংশিকভাবে বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলেরই স্কন্ধে গুরু ঋণের বোঝা চাপিয়াছে। দারিদ্র্য জনিত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের অভাব, ভূমির বর্ত্তমান অনুর্ব্বরতা ও জনসংখ্যার চাপ, শোষণের সহস্রবিধ কৌশল, কাঁচা মালের মূল্য হ্রাস প্রভৃতির কুফল উভয় সম্প্রদায়ের কৃষককেই সমভাবে ভোগ করিতে হইতেছে।

ইহাদের যদি এই সমস্তের প্রতিকারের জন্য দল বাঁধিতে হয় তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষককেই এক সঙ্গে তাহা করিতে হইবে। নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া হিন্দু কৃষক হিন্দু জমিদারের সঙ্গে অথবা মুসলমান কৃষক মুসলমান জমিদারের সঙ্গে দল বাঁধিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আবার কৃষক সাধারণের মিলিত চেষ্টার ফলে যদি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়—নূতন ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, অন্যায় শোষণ হইতে কৃষকেরা মুক্তি পায়, জমিদারী ও মহাজনী প্রথা লুপ্ত হয়, শ্রমশিল্পের প্রসারের জন্য ভূমির উপর হইতে চাপ কমিয়া গিয়া কৃষকের কর্ম্মাভাব দূর হয়, কারখানাজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে হিন্দু ও মুসলমান সমভাবেই লাভবান হইবে। এই ভাবে যেদিক দিয়াই বিচার করা যাক, সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহা দেখা যাইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অথবা প্রতিযোগিতা নাই। আবার ইহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জমিদার ও মহাজনের সঙ্গেও ইহাদের স্বার্থের কোনও ঐক্য নাই—থাকিতেও পারে না।

তাহারও পরের কথা, যেসব পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহাদের প্রাচুর্য্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হইতে পারে দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার জন্যও যেমন উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনই সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের মধ্যে এদিক দিয়াও পরস্পর স্বার্থের সম্পূর্ণ অভিন্নতা রহিয়াছে।

কৃষকদের সম্পর্কে যাহা বলা হইল, শ্রমিকদের সম্পর্কেও সেকথা সম্পূর্ণভাবে সত্য। এদেশে বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত। এই শাসন-ব্যবস্থা বিদেশী কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের ইঙ্গিতে পরিচালিত

হয়। এই জন্য কারখানা-শিল্পের প্রসার এখানে নিতান্তই সীমাবদ্ধ। শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা, কর্ম্মের অনিশ্চয়তা, স্বল্প বেতন, দৈনিক শ্রমের দীর্ঘতর সময়, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের অভাব, জীবনযাত্রার অত্যন্ত নিম্নমান প্রভৃতি শোচনীয় দুর্গতি শ্রমিক-সাধারণের বুকে ব্যাপকভাবে চাপিয়া রহিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকই এই সব দুঃখ দুর্দ্দশার সমভাগী। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের প্রতি এই সব দুঃখ দুর্দ্দশার কোনো পক্ষপাত নাই। কারখানার কোনো হিন্দু মালিক, নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া নিজ কারখানার হিন্দু শ্রমিকদের কোনো বিশেষ সুবিধা দিতে ইচ্ছুক বা স্বীকৃত হইবেন না। মুসলমান শ্রমিকদের সম্পর্কেও মুসলমান কলের মালিকদের কোনো বিশেষ অনুকূল মনোভাব নিশ্চয়ই দেখা যাইবে না। শ্রমিকরা যদি নিজেদের অবস্থার প্রতিকার চান তবে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের একসঙ্গে দল বাঁধিতে হইবে। যদি ইহাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, কর্ম্মের স্থায়িত্ব বর্দ্ধিত হয়, দৈনিক শ্রমের সময় কমিয়া যায়, বেতন বাড়িয়া যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সর্ব্বোপরি শ্রমশিল্পের প্রসার ও নিয়ন্ত্রণে এই শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শ্রমিকরাই সেই সুবিধার অংশভাগী হইবেন। এই সব সুবিধা কার্য্যতঃ লাভ করিবার জন্য যে-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার হইবে তাহাতেও দুই সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের স্বার্থ ও কর্ত্তব্য এক ও অভিন্ন।

তাহার পর, যাহাদের কৃষিযোগ্য ভূমি নাই, অথচ যাহারা কারখানার শ্রমিকও নয় এমন অনেক লোককেও জীবিকার জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি শ্রমশিল্পের অধিকতর প্রসার

হয় তাহা হইলে ইহাদের এক অংশ কাজ পাইয়া যাইবে। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমির পুনর্বণ্টন হইলে কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হইবে, এবং তাহাদের ক্রয়-শক্তি বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলেও বর্ত্তমানের কর্ম্মহীনদের পক্ষে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের উদ্ভব হইবে, এবং তাহার দ্বারা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এই পর্য্যায়ভুক্ত লোকেরাই লাভবান হইবেন।

যদি সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের সকল প্রকার দুর্দ্দশার, সর্ব্ববিধ সমস্যার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিবে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, বেকার সমস্যা প্রভৃতি অতীত ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইবে। ইহার সুফল হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তেরা সমভাবেই লাভ করিবেন।

যাহাদের কথা এপর্য্যন্ত বলা হইল, তাহারাই হইতেছেন দেশের সমগ্র জনসংখ্যার অধিকাংশ লোক। যদি ইহাদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ বা প্রতিযোগিতা না থাকে, যদি অর্থনীতিক শ্রেণীগত স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো প্রভেদ বা বিরোধ না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই বিরোধ অত্যল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে; এবং ইহারাই কৌশলে জনসাধারণের মধ্যে তাহা সংক্রামিত ও প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই ধরণের মুষ্টিমেয় দুষ্ট লোক—যাহারা জনসাধারণের স্বার্থকে খণ্ডিত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে কোন্ প্রশ্রয়ে ও প্ররোচনায় ইহা করা সম্ভব হইতেছে, কাহাদের শক্তি ও উৎসাহ ইহার পিছনে থাকিয়া কাজ করিতেছে?—সেই কথাটা আজ সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

হয়ত প্রশ্ন উঠিবে, কেন এবং কী উপায়ে ইহাদের কৌশল জনসাধারণের মধ্যে এতটা সফলতা লাভ করিল ? জনসাধারণের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো ভিত্তি না থাকে তাহা হইলে কোনো কৌশলেই তাহাদের বিপথে চালিত করা সম্ভব হইবে না। কাজেই কী করিয়া সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইল এবং কিসের জোরেই-বা ইহা পুষ্ট হইতেছে তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই বিষয়েরই অলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার মূল—সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

ভারতবর্ষে আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যায় যখন বিশেষ বিব্রত তখন জগতের অন্যান্য দেশের দিকেও একবার তাকাইয়া দেখিতে পারি। এবিষয়ে ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পার্থক্য স্বতঃপ্রতীয়মান। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ তো দূরের কথা—পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই মানুষ আর ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত নহে। সর্ব্বত্রই ভৌগলিক সীমা, ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়াছে।

ইহুদি ও নিগ্রো নির্য্যাতনের সহিত সাম্প্রদায়িক বিরোধের একটা আকারগত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কোনো দেশের পক্ষেই সমস্যার কথা নহে। ইহা শাসক গোষ্ঠীর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় ও পথ মাত্র। আর ইহারও ভিত্তি—বংশ, ভাষা এবং সংস্কৃতি। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ইহাদের পার্থক্যের সীমাগুলিকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছে।

অথচ ইতিহাস পাঠকের কাছে এ-তথ্য অবিদিত নাই যে, ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক বিরোধই একদিন সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত ছিল। মধ্য যুগের ইতিহাস এই ধর্ম্মের বিরোধের রক্তাক্ত কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইওরোপের রাজনীতি ও সমাজ বহুদিন ধরিয়া ধর্ম্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং সাধারণ মানুষ ধর্ম্মকেই তাহার চিন্তা ও কার্য্যের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টান জগতের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ, ইতিহাসের একটি বিস্তৃত অধ্যায় জুড়িয়া আছে। ক্রুসেডের ধর্ম্ম-যুদ্ধে ইওরোপের দূরতম প্রান্তের লোকেরাও যোগদান করিয়াছে। ক্যাথলিক ও প্রোটেসট্যাণ্টদের বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া এক সময় সমগ্র পশ্চিম মহাদেশের রাজনীতি আবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে, খৃষ্টান ও ইহুদীর মধ্যে ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক সংঘাত আমরা বর্ত্তমানের সুসভ্য ও সাম্প্রদায়িক সমস্যামুক্ত দেশসমূহের অতীত ইতিহাসে দেখিতে পাই। কিন্তু, কেনই-বা অতীতে এই সকল দেশে আমাদের দেশের ন্যায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদ্যমান ছিল, আর কী করিয়াই-বা ঐসব দেশ এই সমস্যা হইতে মুক্ত হইল ?

সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের সহিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, মানুষের মনের গঠন ও প্রকৃতি কীভাবে সংশ্লিষ্ট সে কথা যদি আমরা মনে রাখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক সমস্যার অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। ধনতন্ত্র-পূর্ব্ব সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশিষ্ট রূপই হইতেছে ধর্ম্ম। উৎপাদন-ব্যবস্থাই ধর্ম্মকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিলেও সমাজের এই প্রধান নিয়ামক শক্তিটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মকেই সব কাজের মূল বলিয়া লোকে ধরিয়া লইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া সমাজের

প্রভু-শ্রেণী বর্গকে কাজে লাগাইবার জন্য ইহার মূল অনেক দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

কৃষি ও তাহার আনুষঙ্গিক কুটির-শিল্প সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি। ভূমি যেখানে উৎপাদনের প্রধান এবং বলিতে গেলে একমাত্র উপায়, সমাজ সেখানে স্বভাবতই স্থিতিশীল : জীবনের গতি মন্দাক্রান্তা। এই স্থিতিশীলতার পরিবেশে মানুষের অফুরন্ত উদ্দম, বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া সমাজের সম্মুখে নিত্য নূতন সমস্যা উপস্থিত করিতে পারে না। বর্ত্তমান সেখানে যেন অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। আজকের নূতন দিন যেন গতকালের পুরানো দিনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহে না—দুঃখ, কষ্ট ও বঞ্চনার মধ্যে নিত্য নূতন আশা ও সম্ভাবনা মানুষকে সকচিত ও চঞ্চল করিয়া তুলে না, দ্রুত পরিবর্ত্তন ও অবস্থান্তর লোকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় ও শাশ্বত বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়া যায় : ভবিষ্যতের উপর, কোনো প্রকারের পরিবর্ত্তনের উপর লোকের বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়, এবং গতানুগতিক জীবনধারাই মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়।

অথচ মানুষের দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ থাকিয়াই যায়, এবং তাহার জন্য আশ্বাসেরও প্রয়োজন হয়। আবার বিজ্ঞান এ সময়ে অপরিণত থাকে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার থাকে না বলিলেই হয়। অথচ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এ সকল প্রয়োজন হইতেই ধর্ম্মের মূল দৃঢ় হয় এবং মানুষের জীবনের উপর তাহা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং তাহাও শোষিত হইয়া অত্যন্ত মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে

সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা ও উপভোগ এই মুষ্টিমেয় লোকের বাহিরে আর যায় না। অথচ, মানুষের জীবনের অপরিহার্য্য বহু প্রয়োজনের কথা লোকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না. বহু অপূর্ণ সাধ মনে ব্যথা দেয়। কিছুলোকে যখন সুখ ভোগ করিতেছে, অগণিত লোকের ভাগ্যে তখন কেন-যে অবিচ্ছিন্ন দুঃখ তাহা লোক বুঝিতে পারে না। অনাহারে বিনা চিকিৎসায় স্ত্রীপুত্র মরে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জুটে না ;—কিন্তু কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই মনে করিতে হয়, কোন-না-কোন পাপের ফলে এরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিতেছে। মুস্কিল হয় যে, আবার চোখের উপর দেখা যায়, যে সব কাজকে লোকে পাপ বলিয়া মনে করে অবাধে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক লোক সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। আর সারা জীবন নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়াও অন্যেরা দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না। অগত্যা জন্মান্তরের কল্পনা করিতে হয়, পূর্ব্ব জন্মের পাপকে বর্ত্তমান জীবনের দুঃখের জন্য এবং পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিকে বর্ত্তমান জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দায়ী করিতে হয়। অলৌকিক কারণ দূরীভূত করিবার জন্য অলৌকিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এ জীবনের দুঃখের কথা ভুলিয়া পরবর্ত্তী জীবনের সুখের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত আর কী করিবার আছে ? জীবনের যত অপূর্ণ বাসনা ও সাধ কোথায় গেলে পূর্ণ হইবে ! স্বর্গের কল্পনা হইল। এ জীবনে পাপ করিয়াও যাহারা কোনো শাস্তি পাইল না তাহাদের জন্য নরকাগ্নির কল্পনা ব্যতীত আর সান্ত্বনা কোথায় ? এই ভাবে মানুষের জীবনে ধর্ম্মের প্রভাবই সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠে।

ইহা ব্যতীত আরও-সব ব্যাপার ছিল। কৃষির জন্য বৃষ্টির উপর

নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু নিয়মিত বৃষ্টি সব সময় হয় না। ইহার অন্য কোনো কারণ সেদিন আবিষ্কার হয় নাই বা জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় নাই। কাজেই দেবতাদের অসন্তোষই ইহার জন্য দায়ী হইল: তাঁহাদের সন্তোষবিধান ব্যতীত সুবৃষ্টি লাভের আর উপায় কী? তাহা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্দৈব আছে। প্রকৃতির কঠোর নিয়মানুবর্ত্তনের মধ্যে সহসা আবির্ভাব ঘটে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের। দেবতাদের রোষ ও বহুলোকের মিলিত পাপ ব্যতীত আর কিসের ফলে ইহা ঘটিতে পারে? পার্থিব কারণের কথা লোকে একেবারেই ভুলিয়া গেল: সবকিছুর জন্য লোকে অলৌকিক প্রতিকারের কথা ভাবিতে লাগিল; ইহলোক অপেক্ষা পরলোকই লোকের চোখে বড় হইয়া উঠিল।

যাঁহারা সমাজের সুবিধাভোগী তাঁহারাও এ সুবিধাকে ছাড়িয়া দিলেন না। সমাজের সাধারণ অবস্থাকে নিজেদের কাজে লাগানো এবং সামাজিক বিধি-বিধানকে তদনুযায়ী করিয়া গড়িয়া তুলাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; মানুষের এই বিশ্বাসকে স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্রের আবির্ভাব হইল। মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ যে ইহলৌকিক নহে, পারলৌকিক—একথা আরও ভাল করিয়া বুঝানো হইল। দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে দুই-একজনের যখন বিলাস, অপচয় ও আলস্যের মধ্যে কাল কাটাইবার সুযোগ আছে, তখন সৌভাগ্যের অধিকারী সেই দুই-একজনের পক্ষে এই মিথ্যা কথাটুকু বলিয়া দেওয়া অধিকতর সহজ যে, এই বৈষম্যের ব্যাপারে তাঁহাদের দায়িত্ব বা দোষ বিন্দুমাত্র নাই এবং অপর পক্ষেরও করিবার মতো কিছুই নাই। পরিবর্ত্তন যাঁহাদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় তাঁহারা লোককে এই কথা বিশ্বাস করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম ও শাশ্বত সামাজিক বিধি-

২০৬৭

বিধান অপরিবর্ত্তনীয়, এবং পরিবর্ত্তন মাত্রেই অমঙ্গলের দ্যোতক। মানুষকে বিশ্বাস করানো সহজ হইল যে, সমাজের বিধি-বিধানকে অক্ষুন্ন রাখাই হইল প্রধান ধর্ম্ম এবং এই সকল বিধি-বিধানকে ভঙ্গ করাই হইল চরম অপরাধ ও পাপ। ধর্ম্মবিশ্বাসকে সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইল এবং সামাজিক বিধানকেই লোকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। লোকের সম্মুখে অতীতই আদর্শস্বরূপ স্থাপিত হইল এবং নিখুঁতভাবে অতীতের পুনরাবৃত্তি করাই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। পাছে মানুষ ভুল করিয়া অতীতকে কোনো দিক দিয়া অতিক্রম করিয়া যায় এইজন্য দৈনন্দিন আচরণের, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি খুঁটি-নাটি সম্পর্কে শাস্ত্রের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা কদাচিত ঘটিত। প্রত্যেক দেশের মানুষই মনে করিত, তাহারাই একমাত্র সভ্য মানুষ, তাহাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ধর্ম্মই একমাত্র সত্য—ইহার সংরক্ষণ ও বিস্তারেই পৃথিবীর কল্যাণ—ইহার কোনো রূপ ব্যতিক্রমে সারা সৃষ্টি রসাতলে যাইবে। কাজেই তাহারা অন্যান্যদেশের মানুষকে অসভ্য বিধর্ম্মী ও সৃষ্টির পাপ স্বরূপ মনে করিত। তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ, ধ্বংস-সাধন, স্বধর্ম্মে আনয়ন, তাহাদের আক্রমণ হইতে যে-কোনো মূল্যে ধর্ম্মরক্ষা প্রভৃতিকে লোকে একান্ত পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত। এই জন্যই সমান্ততান্ত্রিক সমাজে মানুষের দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নামেই অনুষ্ঠিত হইত। এই জন্য ধর্ম্মের নামে লুণ্ঠন, পরদেশ আক্রমণ, একটা গোটা জাতিকে দাস জাতিতে পরিণত করণ প্রভৃতি সবই পুণ্যকার্য্য হিসাবে চলিতে পারিত। ভাগ্যান্বেষীরা লোভ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকের এই ধর্ম্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগাইতে পারিত। এই সকল আক্রমণ হইতে যাহারা

নিজেদের বিত্ত ও আধিপত্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করিত তাহারাও ধর্ম্ম রক্ষার নামে জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত।

অন্যান্য দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ জীবন হইতে ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে—ধর্ম্মের যাহা-কিছু অবশেষ এখনও আছে তাহাও লোকের ব্যক্তিগত জীবনে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবন হইতে ধর্ম্মের প্রভাব কীভাবে বিলুপ্ত হইল?

যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়া যেমন বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের আকারে ধনিক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, পূর্ব্বের সামাজিক কাঠামোতেও তেমনই গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বৈজ্ঞানিক নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলেই ধনতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হইল—আবার ধনতন্ত্রের আওতায় বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া চলিল। পূর্ব্বে যে সকল জিনিষ লোকে অলৌকিক বলিয়া মনে করিত বিজ্ঞান তাহার বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে লাগিল। সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাও পূর্ব্বে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাদের সেই ধারণার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং সমাজের নিম্নস্তরেও তাহা সঞ্চারিত হইল। পণ্যের উৎপাদন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হওয়ায় স্বচ্ছল অবস্থার লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য বহু শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হইল। ফলে শিক্ষার প্রসার অনেক বাড়িয়া গেল এবং বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ইহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় নূতন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মানুষের এতদিনের বিশ্বাস রূঢ় আঘাত পাইল। সমগ্র দৃষ্টি-ভঙ্গীতে একটা নূতন পরিবর্ত্তন আসিল; সমাজ-দেহে যে গতি-বেগ সঞ্চারিত হইল পুরাতন আদর্শকে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমিই উৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল বলিয়া গ্রামই ছিল সমাজের ভিত্তি। কিন্তু, কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সমাজে ভাঙ্গন ধরিল এবং সমাজের প্রাণকেন্দ্র সহরে চলিয়া গেল। নানা স্থানের নানা লোক শিল্প-কেন্দ্র সমূহে আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ও ধর্ম্মের লোকের একত্র বাস করিতে হইতে লাগিল। নানা রকমের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি পরস্পরের সন্নিহিত হইল। পুরাতন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন সমাজ গড়িয়া লইতে হইল। জীবনযাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অনিশ্চিত হইয়া গেল ও প্রত্যেক লোককেই নিজের বাঁচিবার জন্য প্রয়াস করিতে হইতে লাগিল। পল্লীসমাজে যৌথ-পরিবারকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-জীবন গড়িয়া উঠিত। কিন্তু, জীবন-যাত্রা অনিশ্চিত হওয়ায়, জীবন-সংগ্রাম তীব্র হওয়ায় এবং প্রত্যেক লোককেই তাহার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হওয়ায় নূতন সমাজে ব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করিল। বিবাহ, সমাজ ও পরিবারে নারীর স্থান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমারেখা মুছিয়া যাইতে লাগিল। একই পরিবর্ত্তনের স্রোত আসিয়া সকলের গায়ে আঘাত করিল এবং সকলকে একমুখে লইয়া গিয়া এক করিয়া দিল।

লোককে সব সময় আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইতে লাগিল বলিয়া লোকে চেষ্টার ফল প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইল। ইহাতে একদিকে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল এবং দৈবশক্তি অর্থাৎ ধর্ম্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাস শিথিল হইতে লাগিল। লোকে চোখের উপর দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিল। গ্রাম্য সমাজ হইতে নাগরিক সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিল, আবার

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনও একস্তর হইতে অন্যস্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল।

যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। যুদ্ধের জন্য যেসব নূতন প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহাতে সমাজে আরও পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন, সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও চাপে এবং বহু লোকের আশ্রয়হীনতা সম্বলহীনতা ও কর্ম্মহীনতা প্রভৃতি এবম্বিধ তীব্র দুঃখের চাপে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ভেদ দূর হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত দ্রুতগামী যান-বাহনের প্রচলন, দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা, প্রেস, রেডিও প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; পূর্ব্বেকার স্থিতিশীল জীবনে যেসব বিধি-নিষেধ, যেসব শাস্ত্রিক বিধান ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলা সম্ভব ছিল—পরবর্ত্তী ধাবমান জীবনযাত্রায় তাহা সম্ভব হয় না। প্রতিপদে নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—শাস্ত্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয়। ব্যক্তিগত চেষ্টা ও ক্ষমতার উপর লোককে অধিকতর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া যোগ্যতা, শিক্ষা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং এসকল গুণের আদর সমাজে অনেক বাড়িয়া যায়। এই সকল গুণের অধিকারী লোক যে-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হোন-না-কেন, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল লোকের মধ্যেই তাঁহার আদর ও সম্মান বাড়িয়া যায়। এই সকল লোকের প্রয়োজনীয়তাও সব সম্প্রদায়ের লোকের কাছে সমান হইতে থাকে এবং সম্প্রদায়ের গণ্ডী ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়ে।

সমাজে চেষ্টার ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমস্বার্থ-বিশিষ্ট লোকদের সংঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিতে হয়। স্বার্থের

তাগিদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের একত্রিত হইতে হয়, আবার নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সহিতও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে চেষ্টা ও কাজের প্রাধান্য বাড়িয়া যায় বলিয়া এবং স্থিতিশীলতা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অবসর যাপনের জন্যও নূতন রকমের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হয়। আগের মতো পাড়ার লোকদের লইয়া তাস-পাশা খেলিয়া গল্প-গুজব করিয়া সারা জীবনের অবসর সময় কাটাইয়া দেওয়া যায় না। লাইব্রেরী, ক্লাব, রেঁস্তোরা, চায়ের দোকান, খেলার মাঠ প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। এ সবের মধ্য দিয়া মানুষের নূতন সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে; এ সকল স্থানে নিত্য নূতন লোকের আনাগোনা, নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়, নূতন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। অতীতের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষা করা এবং আটঘাট বাঁধিয়া, সাম্প্রদায়িক সীমারেখা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলাফেরা করা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে আজও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান—তবুও আমাদিগকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে এবং সমাজের ক্ষীণ প্রান্তভাগ ইহার দ্বারা প্রভাবিতও হইয়াছে। পল্লী যদিও এখনও এখানে সমাজ-জীবনের কেন্দ্র, তবুও তাহারই পাশে ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের নাগরিক জীবনের মূল শিকড়টি এখনও পল্লীসমাজের মধ্যেই প্রোথিত—অর্থাৎ নগরবাসীদের অধিকাংশই নগরপ্রবাসী পল্লীর অধিবাসী। পল্লীসমাজের আদর্শ ও রীতি-নীতির দ্বারাই আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এইজন্য আমাদের নাগরিক জীবনও পল্লী জীবনের নাগরিক সংস্করণ মাত্র। তবুও এই নাগরিক জীবন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং এই সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ ইহার অঙ্গে বিদ্যমান।

সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের পার্থক্যটা সহজেই এখানে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। পল্লী ছাড়িয়া যেদিন রেল-গাড়ীতে চড়ি, সেই দিনই শাস্ত্রের বিধান, সমাজের অনুশাসন, জাতির বিচার শিথিল হইয়া যায়। যাহার দর্শনমাত্রে খাদ্য অশুচি হয় বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছি, যাহার স্পর্শ বাচাইয়া না চলিলে নিরয়গামী হইতে হইবে বলিয়া শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি—রেল-গাড়ীতে তাহার সহিত একসাথে বসিতে হইল—একই কামরায় জলপান করিতে হইল। সহরে আসিয়া খাদ্যে হউক, পানীয়ে হউক বা একত্রে মেলামেশায় ও বন্ধুত্বে হউক, নিজ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকা আর সম্ভব হইয়া উঠে না। শাস্ত্রের অনুশাসন দূরে চলিয়া যায়, সম্প্রদায়ের গণ্ডি মুছিয়া যায়। তবুও আমাদের নাগরিক জীবন যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ নাগরিক জীবনের মূল আজও পল্লীসমাজের মধ্যে নিহিত। লোকের প্রাত্যহিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার স্থান না থাকিলেও, সামাজিক ভাবে লোকে এই অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। স্বার্থান্ধ লোকের কৌশলে ও চক্রান্তে ইহাই মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

সম্ভবতঃ পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উদিত হইবে। আমাদের সমাজব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক হইলেও এখানে শ্রমশিল্পও কিছু পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল শিল্পকেন্দ্রে, বিশেষতঃ শ্রমিকদের মধ্য হইতে অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক অনুভূতি অন্তর্হিত হওয়া উচিত ছিল। সহর সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষেত্রেও অবশ্য তাহাই সত্য। আমাদের শ্রমিকেরাও কৃষক-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অনেক পরিবারই আংশিকভাবে শ্রমিক ও আংশিকভাবে কৃষক—প্রায়

সকলেরই আত্মীয়-কুটুম্বাদি কৃষক ; বিবাহাদির আদান-প্রদান যাহাদের সহিত হয় তাহারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষক। কাজেই কৃষক-সমাজের মনোভাব হইতে ইঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না। শ্রমিকদের মধ্যে এমন লোক অবশ্য কিছু কিছু আছে যাহারা দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া শ্রমিক-কেন্দ্রেই বসবাস করিতেছে এবং পল্লীসমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক হইয়াছে। কিন্তু, যে শ্রমিকদের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে সেই শ্রমিকদের সহিত পল্লীসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে ; এবং এখানে আসিয়াও তাহারা যে-সামাজিক আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তাহা পল্লীসমাজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বহু শ্রমিকের যদি প্রত্যক্ষ ভাবে পল্লীর সহিত সম্পর্ক নাও থাকিত, তাহা হইলেও সমগ্র দেশের যে-সামাজিক আবহাওয়া তাহার প্রভাব হইতে ইহারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারিতেন না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা, জনসমাজের উপর ধর্ম্মের প্রভাব প্রভৃতি-যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার কারণ ইহা নহে যে, সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করিবার, জনসমাজের উপর হইতে ধর্ম্মের প্রভাব শিথিল করিবার বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টার ফলে ইহা হইয়াছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজে আপনা হইতে অপরিহার্য্য ভাবে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহারই ফলে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ হইয়াছে। আমাদের দেশে অধুনা সাম্প্রদায়িকতার যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার পশ্চাতে অনেক কৌশল, অনেক চক্রান্ত, অনেক স্বার্থের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। কিন্তু, এ কথা সত্য যে, কোনো কৌশল বা কোনো চক্রান্তের দ্বারাই ইহা ঘটানো সম্ভব হইত না—যদি-না লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি

বর্ত্তমান থাকিত। লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধি আছে বলিয়া, জনসমাজ ধর্ম্মের দ্বারা বিভক্ত রহিয়াছে বলিয়া সেই অনুভূতিকে বিরোধের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলা সম্ভব হইয়াছে। যতদিন দেশ হইতে সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ না হইতেছে, সমাজ হইতে ততদিন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়গত বিভাগের অবসান হইবে না। আর এই মূল কারণ যতদিন পর্য্যন্ত অপসারিত না হইবে ততদিন ইহাকে বিপথে লইয়া গিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইবার লোকও জুটিবে। সামন্ত প্রথাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা যখন দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহিতেছি, তখন কর্ত্তিত মূল গাছের আগায় জল ঢালিয়া তাহাকে বাঁচাইবার ন্যায় অসাধ্য সাধন করিতে চাহিতেছি মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

সামন্ততন্ত্রের রক্ষক—ধনিক সাম্রাজ্যনীতি

অন্যান্য দেশে যখন সামন্ততন্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে তখন আমরা কেন আজও তাহার জের টানিয়া চলিতেছি? বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতাকে আমরা অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিয়া ভুল করিয়া থাকি এবং তাহার ফলে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার আমাদের দেশে প্রচলিত রূপকে প্রাচ্যদেশীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করি। আমরা আজও মধ্যযুগের জের টানিয়া চলিতেছি, এবং তাহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু, আসলে আমাদের এখানে গৌরব করিবার কিছুই নাই। বরং এই কথা ভাবিয়া লজ্জিত হওয়া উচিত যে, এখানে অন্য লোকের স্বার্থের ক্রীড়নক হিসাবেই আমরা কাজ করিতেছি। আমাদের আত্মরক্ষার শক্তির ফলে নহে, স্বার্থ-বিশিষ্ট তৃতীয়পক্ষের বাধাদানের ফলেই আজও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং আমরা মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি।

অন্যান্য দেশে যেসব কারণে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়া ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে—এই দেশেও সেই একই কারণে ইহার অনেক পূর্ব্বেই সামন্ত-প্রথা লুপ্ত হইত, সম্প্রদায়গত দল ভাঙ্গিয়া গিয়া অন্য প্রকার দলের আবির্ভাব হইত এবং ধর্ম্মের প্রভাব সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভরশীল হইত। কিন্তু, স্বার্থবিশিষ্ট তৃতীয় পক্ষই কৃত্রিম উপায়ে ইহাকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। সামন্ত-প্রথার জীবনের মেয়াদ এইভাবে ফুরাইয়া গেলেও কেন এবং কীভাবে তাহা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহা দেখিতে হইলে এই প্রথা বাঁচিয়া থাকিলে কাহাদের স্বার্থ পুষ্ট হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্রের শাসনাধীন। কাজেই, আমাদের সমস্ত ব্যাপারের মূলে তাঁহাদেরই স্বার্থের প্রেরণা রহিয়াছে। তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সকল কাজ-কর্ম্ম পরিচালিত হয়—যদিও আমাদের স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্যই তাহা করা হয় বলিয়া আমাদের কাছে বলা হয় এবং সারা বিশ্বে উঁচু গলায় তাহাই ঘোষণা করা হয়। আমরা যাঁহাদের শাসনাধীন তাঁহাদের স্বার্থটা এ সম্পর্কে কোথায় তাহা দেখিতে হইবে।

ব্রিটেন খুব উন্নত শিল্পপ্রধান দেশ; কারখানায় উৎপন্ন পণ্যই তাহার প্রধান সম্পদ। ইংলণ্ডের ধনিক গোষ্ঠীই এই পণ্যের মালিক। তাঁহাদের এই বিপুল পণ্য-সম্ভার বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার চাই ও পণ্যের উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সস্তা কাঁচামালের অফুরন্ত যোগান চাই। সুতরাং এজন্য তাঁহাদের এসিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজন।

প্রথম কথা, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে যদি যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে, যদি এ সকল দেশে বহুল পরিমাণে কল-কারখানা গড়িয়া উঠে, তাহা

হইলে এখানকার লোকেরা বাহিরের জিনিষ কিনিবে না এবং এখানকার কাঁচামালও অন্যের পক্ষে সস্তায় কিনিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না। যতদিন এই সব দেশ পশ্চাদ্বর্ত্তী ও মধ্যযুগীয় থাকিবে ততদিনই এ সকল দেশের লোকের কাছে পণ্য বিক্রয় করা যাইবে এবং কাঁচামালও পাওয়া যাইবে। কাজেই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, নানাবিধ সরল ও জটিল উপায়ে এদেশে কারখানা শিল্পের বিস্তারে বাধাদানই সাম্রাজ্যিক নীতির মূল কথা। যুদ্ধের সময় যখন দ্রুত উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা চরমে পৌছিয়াছে তখনও এদেশে কারখানা-শিল্পের বিস্তারে কর্ত্তৃপক্ষের অনিচ্ছার দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। একদিকে কারখানা-শিল্পের বিস্তারে বাধা দিয়া ও অন্যদিকে প্রাচীন ভূমি-ব্যবস্থাকে রক্ষণ করিয়া ইহারা সামন্ততন্ত্রকে রক্ষা করিতেছেন। সামন্ততন্ত্রকে রক্ষা করিবার ইহাদের আরও অন্য প্রয়োজন আছে।

সামন্ত-প্রথাই [বিভিন্ন আকারে জমিদারী ব্যবস্থা, করদ ও মিত্র রাজ্য প্রভৃতি] প্রকৃতপক্ষে এ দেশের উপর ব্রিটিশ ধনিকের কর্ত্তৃত্ব রক্ষায় সাহায্য করিতেছে। শোষণ ও দেশের উপর রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব রক্ষণাকল্পে সামন্ত-প্রথাই ব্রিটিশ ধনিকের একমাত্র মিত্র। এক জমিদার প্রভৃতি শ্রেণী ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ হইতেছে ব্রিটিশ ধনিকদের স্বার্থবিরোধী। বিদেশী ধনিক কর্ত্তৃত্বের অবসানে অন্য সকল শ্রেণীই লাভবান হইবেন। এই জন্য ধনী হোন, কৃষক হোন, শ্রমিক হোন, বিদেশী মধ্যবিত্ত হোন, বিদেশী ধনিক কর্ত্তৃত্বের অবসানে সকলেই লাভবান হইবেন। কেবল জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর দেশের ভিতর কোনো আশ্রয় নাই—বিদেশী ধনিকদের আশ্রয়ই ইহাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। বিদেশী ধনিক-শ্রেণীর সহিত ইহাদের কোথাও স্বার্থের সংঘাত নাই—ইঁহাদের স্বার্থের সংঘাত এদেশেরই অন্যান্য লোকের সহিত। এই অবস্থায়

পড়িয়া যাহাতে এদেশে ব্রিটিশ ধনিকদের প্রভুত্ব রক্ষিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা ইঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক—ইহারা করিতেছেনও তাহাই। এদেশে ব্রিটিশ ধনিক-প্রভুত্বের ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহায় ও সমর্থনকারী—ইহাঁদের সাহায্যই সাম্রাজ্যতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্বল। এইজন্য নিজের স্বার্থের খাতিরেই ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্র এদেশে সামন্ততন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

এই সামন্ততন্ত্র তাঁহাদিগকে অন্যভাবেও সাহায্য করিতেছে। সামন্ত-প্রথার ফলেই সাম্প্রদায়িকতা বাঁচিয়া আছে এবং সাম্প্রদায়িকতা আছে বলিয়াই ইহাকে ভারতবর্ষের গণশক্তিকে ভাগ করিয়া রাখিবার কাজে লাগানো যাইতেছে। দেশে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকিত তাহা হইলে জাগ্রত গণশক্তিকে বিভক্ত ও আত্মকলহে লিপ্ত রাখা সম্ভব হইত না। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে সাম্প্রদায়িকতা আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র।

সামন্ততন্ত্র একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়া সামন্ততন্ত্রকে দীর্ঘ জীবন দান করা সম্ভব হইতেছে। বাহিরের সাহায্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে যে সকল শক্তি কাজ করিত, সামন্ততন্ত্রকে কৃত্রিম উপায়ে বাহিরের সাহায্যে বাঁচাইয়া রাখিয়া, সেই সকল শক্তি যাহাতে দানা বাঁধিতে না পারে, সাম্প্রদায়িকতাকে সাহায্য করিয়া তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সামন্ত-প্রথার জন্য কৃষকদের মধ্যে যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও অভাব দেখা দিয়াছে, তাহাই বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া দিত ; আর এই সংগ্রামের সময় কৃষকগণ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাহাদের স্বার্থের ঐক্য বুঝিতে পারিত। কিন্তু, এই শক্তি

দানা বাঁধিবার পূর্ব্বেই সাম্রাজ্যিক সামরিক শক্তিপুষ্ট রাষ্ট্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহাকে পিষ্ট করিয়া ফেলে এবং ইত্যবসরে সাম্প্রদায়িকতাকে নানাভাবে ফাঁপাইয়া তুলিয়া গণশক্তিকে খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করিয়া দেয়। সাম্রাজ্যিক ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ—অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়াই সামন্ত বর্গের প্রতি শাসকবর্গ এতটা সহানুভূতিশীল। গণশক্তিকে খণ্ডিত ও আত্মকলহে লিপ্ত রাখিবার জন্য আজ প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে বলিয়া, সাম্প্রদায়িকতার একমাত্র ভিত্তি সামন্ত তন্ত্রকে রক্ষণ করিবার জন্য সাম্রাজ্যিক নীতির সদা সতর্ক দৃষ্টি। সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিয়া এবং দানা বাঁধিতে সাহায্য করিয়া একই সঙ্গে উভয়কেই রক্ষা করা হইতেছে।

মহারাণীর ঘোষণা হইতে নবতম শাসন সংস্কার পর্য্যন্ত আমরা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যিক নীতির এই দিকটাকে দেখিতে পাই। মহারাণীর ঘোষণায় ধর্ম্মের স্বাধীনতা দানকে আমরা নিতান্ত নির্দ্দোষ ও উদার নীতির পরিচয় বলিয়া জানিয়াছি, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা অধ্যুষিত দেশে ইহা সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়াইয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে যাহাতে সামন্ততন্ত্র ও রাজ্যরক্ষণ করা যায় তাহার জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনীতিক অধিকার ও সুবিধা সমূহকে ভাগ করিয়া জমিদার, নবাব, রাজা, মহারাজা ও সর্ব্বোপরি দেশীয় নৃপতিবৃন্দের উপর সাম্প্রদায়িকতা রক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সামন্তেরা এই ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা রক্ষণ করিবেন আর সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের পথ অবরুদ্ধ হইবে। এই ভাবে উভয়েই উভয়কে শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট করিবে এবং উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে জাতীয় শক্তি প্রতিহত হইবে। সাম্প্রদায়িকতাই হইবে সামন্তবর্গের ও

অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে প্রধান ও অব্যর্থ অস্ত্র। এই নীতি যে কল্পনানুযায়ী কাজ করিতেছে তাহা আমরা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছি। এই-যে সেদিনও আমেরি সাহেব বলিলেন যে, মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতীত ভারত সম্পর্কে কিছু করা হইবে না তাহাও এই সাম্প্রদায়িকতাকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য। যুদ্ধের সঙ্কটের সময় বহু প্রত্যাশিত শাসন সংস্কারেও যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান থাকিবে তাহারও আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনীতিক ও ঐতিহাসিক প্রভাবের বিকৃত রূপ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মূল নিহিত। কিন্তু, এখান হইতে রস সংগ্রহ করিলেও অনুকূল অবস্থার আলোবাতাসেই তাহা বর্ধিত হইয়াছে এবং শাখা প্রশাখার বিস্তারে সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা এই শাখা প্রশাখাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং ইহাই আমাদের দৃষ্টিকে মূলদেশ পর্যন্ত পৌছিতে দিতেছে না। এই জন্য মূল কারণের সহিত কোন্ কোন্ অবস্থার আনুকূল্যে সাম্প্রদায়িকতা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাও দেখিবার প্রয়োজন আছে। ইহার স্বরূপ কী, কীভাবে ইহা আমাদের সমাজ-দেহে কাজ করিতেছে, ইহার সমর্থনসূচক যুক্তির ভুল কোথায়—তাহা সব উদ্ঘাটিত করিতে হইবে এবং ইহার উচ্ছেদ চেষ্টাও তন্নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

প্রথমে ইতিহাসের প্রভাবের কথাই বিবেচনা করা যাক। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পূর্ব্বে ধর্ম্মই মানুষের দল গঠনের প্রধান অবলম্বন ছিল। বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য জীবনের মধ্যে তখন আত্মীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠে নাই। মুসলমানেরা যখন এই দেশ জয় করেন, তখন তাঁহারা বিশেষ কোনো দেশের লোক বলিয়া নিজেদের মনে করিতেন না, বিশেষ ধর্ম্মের লোক হিসাবেই আসিয়াছিলেন—ধর্ম্মই ছিল তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। যে সমস্ত ভাগ্যান্বেষী ভারতবর্ষের ধনরত্নের প্রতি প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন—অর্থলুণ্ঠন ও সম্পদ-লাভই ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ঐ সমস্ত দেশের জীবনযাত্রার কঠোরতাই ছিল তাঁহাদের সৈন্য-সংগ্রহের প্রধান সহায়। কিন্তু ধর্ম্মের প্রেরণাকেই তাঁহারা স্বার্থপুষ্টির কাজে লাগাইয়াছিলেন। এদেশীয়দের উপর তাঁহাদের আচরণও ছিল তদনুরূপ। তখনকার মন্দিরগুলিতে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়া থাকিত। কাজেই সেইগুলিই আক্রমণকারীদের প্রধান লক্ষ্য হইল। এই আক্রমণকে আক্রমণকারীদের অনুচরেরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করিল।

ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এদেশীয়েরাও এই আক্রমণকে বিধর্ম্মীদের আক্রমণ বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইলেন। তখনকার দিনে রাজার পরিবর্ত্তনে সাধারণ লোকের বড় বেশী-কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ আক্রমণ ও দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সাধারণ লোকের বেশী-কিছু ঔৎসুক্যও ছিল না। কাজেই ধর্ম্মের ধ্বনি দিয়াই এই দেশের লোকদের একত্রিত করিতে হইয়াছিল। দেশরক্ষা নয়—ধর্ম্মরক্ষার প্রেরণাতেই সাধারণ লোক উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে সেদিনকার আক্রমণ ও যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের চেয়ে ধর্ম্ম বিপন্ন বলিয়াই লোকে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত হইল।

দুইটি সভ্যতা সন্নিহিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল তাহাও ধর্ম্মের দ্বন্দ্বেরই রূপ গ্রহণ করিল। দেশ জয়ের পর বিজেতাদের দ্বারা বিজিতদের উপর যেসব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, বিজেতারা ধর্ম্মে মুসলমান ও এদেশীয়রা ধর্ম্মে হিন্দু ছিলেন বলিয়া এবং লোকে সব ব্যাপারকে ধর্ম্মের কথায় ব্যাখ্যা করিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া তাহা হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। যাঁহারা দেশ জয় করিলেন তাঁহাদের অনুচরেরাও জাতীয়তা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নাই—ধর্ম্মের প্রেরণাতেই ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া দেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই দেশের লোকদিগকে বিজিত দেশের লোক বলিয়া যতটা না হোক, কাফের বলিয়াই বেশী ঘৃণা করিতে লাগিল এবং তাহাদের ধর্ম্মের উপর, পৌত্তলিকতার উপরও আক্রমণ চালাইতে লাগিল।

ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব অন্য রকমেও তীব্রতা ও স্থায়ীত্ব লাভ করিল। হিন্দু ধর্ম্ম ছিল স্থিতিশীল—অন্য ধর্ম্মের লোক হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত না;—অপর পক্ষে মুসলমান ধর্ম্ম ছিল প্রসারশীল—অন্য ধর্ম্মের লোককে ইসলামে দীক্ষিত করাই ছিল এই ধর্ম্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মুসলমানেরা যখন এই দেশের লোককে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে লাগিলেন তখন ধর্ম্মরক্ষা সম্পর্কেই এদেশীয়েরা বেশী শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কোথাও কোথাও জোর-জবরদস্তি ও জুলুম-যে না চলিল তাহা নহে। ইহা এক পক্ষকে যেমন ত্রস্ত করিল, অন্য পক্ষকেও তেমনি উৎসাহিত করিল। সাধারণ মুসলমানের মনেও এই ধারণা জন্মিয়া গেল যে, ধর্ম্মের বিস্তারের জন্যই তাঁহারা কাজ করিতেছেন। পরস্পর দূরবর্ত্তী দুইটি প্রদেশের একই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ঐক্য ও একই প্রদেশের দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

লোকে সাধারণ আচার-ব্যবহার, চাল-চলন পোষাক-পরিচ্ছদকেও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ভাবিত। দুই পক্ষের এই সব ছোট-খাট ব্যাপারের পার্থক্য দুই পক্ষেরই সাধারণ লোকের কাছে বড় হইয়া দেখা দিত—তাহা ধর্ম্মের দ্বন্দ্বকেই পরিপুষ্ট করিত। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল এবং এ সকলেরও সংঘাত লোকের কাছে ধর্ম্মের সংঘাত বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সীমা-রেখাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

যে ইতিহাসের কথা বলা হইল সে অনেক কালের কথা। তাহার পর অনেক দিন ধরিয়া হিন্দু মুসলমান এক দেশে বাস করিতেছে, একই সুখ সৌভাগ্য দুঃখ দুর্দ্দশা সমভাবে ভোগ করিতেছে। কাজেই, এই মনো-ভাবের তীব্রতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবার কথা। মুসলমান আমলের শেষের দিকে এই সাম্প্রদায়িক সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও পরে জাতীয় অভ্যুত্থানের নামে হিন্দু অভ্যুত্থান (বিশেষ করিয়া মারাঠা ও শিখদের অভ্যুত্থান) সাম্প্রদায়িক অভিমানকে নূতন করিয়া শাণিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হইলেও দীর্ঘদিনের ধারা বাহিয়া আসিয়া এই মনোভাবের বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতটা তীক্ষ্ণ থাকা সম্ভব হইত না যদি-না আরও নানা কারণের যোগাযোগ ঘটিত। এই সকল কারণের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসম-আর্থিকবণ্টন অন্যতম। অর্থসম্পদ, ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদার বণ্টন সাম্প্রদায়িক সীমারেখাকে অনেক দূর অনুসরণ করিয়াছে এবং অনুকূল কারণগুলির মধ্যে তাহার প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

ঘটনাক্রমে এখানে অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সীমারেখা প্রায় মিশিয়া যাওয়ায় এই বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কৌশলী লোকেরাও অর্থনৈতিক

অভিযোগকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে প্রবাহিত করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। নানা ঐতিহাসিক কারণের সমবায়ে সমাজে যে আর্থিক বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার এক দিকে পড়িয়াছেন মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুরা এবং অন্য দিকে প্রধাণত বর্ণ হিন্দুরা। এই দেশে মুসলমানদিগের আগমণের ফলে তখনকার সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যেই এই ধর্ম্মের অধিকতর প্রসার লাভ ঘটিল; কারণ যাহারা অনেক দিন ধরিয়া নিপীড়ন ভোগ করিয়া আসিয়াছে, দুঃখ দুর্দ্দশা ও বঞ্চনাই যাহাদের এক মাত্র ভাগ্য ছিল, নিজেদের ধর্ম্মের কাছেও যাহাদের কোনো মর্য্যাদা বা সম্মান স্বীকৃত হয় নাই তাহাদের পক্ষে ভাগ্য পরীক্ষা স্বাভাবিক ছিল এবং পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের উপরও তাহাদের বেশী আকর্ষণের কোনো কারণ ছিল না।

অন্যদিকে, অর্থ, প্রতিপত্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন নূতন অভিযানের আঘাতটা আসিয়া লাগিয়াছিল তাঁহাদেরই গায়ে—তাঁহাদেরই সুবিধা ও অধিকার বিপন্ন হইতে বসিয়াছিল। কাজেই, একদিকে যেমন তাঁহারা নূতন অভিযানকে প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যখন পরাভূত হইয়াছেন তখন অনেকে দুর্জ্জয় আত্মাভিমানে দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া ধর্ম্মের জন্য শহীদ্ হইয়াছেন; অন্যদিকে তেমনি বেশীর ভাগ লোক আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা কিছু পরিমাণে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগেরও ধর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই। ফলে, যাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন; তাঁহারা অধিকাংশ হিন্দুই থাকিয়া গেলেন। দেশে ধর্ম্মের যে বিভাগ হইল, তাহা সমাজের স্বাভাবিক আর্থিক বিভাগেরই অনুসরণ করিল। দেশের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব বিজেতাদিগের হাতে থাকিলেও দেশের অভ্যান্তরীণ কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা অনেকাংশে পূর্ব্বের লোকদিগের হাতেই রহিয়া গেল।

পরে আবার, ইংরেজ আমলের প্রথম হইতে আমাদিগের মধ্যে স্বাদেশিকতার উদ্ভবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই রাজানুগত্যের দ্বারা এই দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে ও অবস্থায় ছিলেন। তাহার পর মুসলমান শাসনের অবসানে মুসলমান-দিগের মনে যে-আত্মাভিমান জাগিয়াছিল এবং যাহার ফলে তাঁহারা প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়াছিলেন—ইঁহাদের মনে তেমন কোনো আত্মাভিমান জাগে নাই। ইঁহারা এই ভাবে এই দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান সহায় হইয়া উঠিলেন। দেশের যাহা কিছু কায়েমীস্বার্থ ক্রমে ইহাদেরই হাতে আসিয়া পড়িল—অর্থ, সম্পত্তি, ক্ষমতা সব-কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিসের মালিক হইলেন ইঁহারা। শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতে লাগিল। মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ী, ছোট বড় কলকনের মালিক, বড় বড় চাকুরে, উকিল, শিক্ষক, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি সবই প্রায় হইলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।

ধন-সম্পত্তির বেশীরভাগ এইভাবে হিন্দুদিগের হাতে সঞ্চিত হইল। তাই বলিয়া ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সকলেই ধনী ও সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন—তাঁহাদের মধ্যেও বেশীরভাগ লোকই নিঃসন্দেহ দরিদ্র থাকিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত ধনীসমাজের আওতায় থাকিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের বাহিরের চালচলন, জীবনযাত্রা প্রভৃতি অনেকটা ধনীদের অনুরূপ হইল। জীবিকার জন্য কায়িক শ্রম করা অপ্রচলিত হইল। ধনীদিগের অনুগ্রহভাজন হওয়া, তাঁহাদের ছোট-খাট কাজে লাগিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করা অথবা অন্য উপায়ে নিজেরা ধনী হইবার চেষ্টা করা ইঁহাদের জীবনের

প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ছোট বড় ব্যবসা, ছোট ছোট মহাজনী এবং মূলধনের কারবার এই সমাজের মধ্যস্তরের লোকদিগের হাতে আসিয়া পড়িল। অন্যদিকে কায়িক শ্রমের প্রায় সকল কাজ, বিশেষ করিয়া কৃষি, বলিতে গেলে সাধারণ মুসলমানদিগের একমাত্র জীবিকা হইল; কৃষির একটা বৃহৎ অংশ এবং নানাবিধ শ্রমশিল্প হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরের লোক বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদিগের হাতে থাকিলেও, মুসলমান-সমাজের নিতান্ত মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত প্রায় সকলেই কৃষক বা কোনো-না-কোনো প্রকারের শ্রমিক হইলেন। সমাজের এইভাবে যে-ভাগ হইয়া গেল তাহাতে দেখা গেল, জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদার বলিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকেই বুঝাইতেছে; এবং কৃষক ও শ্রমিক বলিতে মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুদিগকে বুঝাইতেছে, এবং বিশেষ করিয়া মুসলমানদেরই বুঝাইতেছে।

এইভাবে সাধারণ মুসলমানেরা বহুদিন ধরিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইলেন যে, কায়িকশ্রম, দারিদ্র্য, ধনী-শ্রেণীর অবজ্ঞা, অশিক্ষা, এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দুরূহতা তাঁহাদের একমাত্র ভাগ্য; অপরদিকে অর্থ, সম্পত্তি, ভোগ-বিলাস, সম্মান, প্রতিপত্তি হিন্দুদিগের একচেটিয়া; হিন্দু সমাজেরও বৃহত্তর অংশ-যে অবজ্ঞাত, অনুন্নত, নির্য্যাতিত ও দরিদ্র থাকিয়া গেলেন, সে ব্যাপারটা স্বভাবতই লোকের চোখে পড়িল না। এই বৈষম্য প্রত্যাশিত বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিধ আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির মধ্যে তাহা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান-কৃষক অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া সে শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু, দেনার দায়ে, জমিদারের কর্ম্মচারীদের নানা হিসাবের মারপ্যাঁচে তাহা উঠে গিয়া অন্যদের ঘরে; এবং বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রেই এই 'অন্যরা' উচ্চবর্ণের হিন্দু। আর তাদের একমাত্র ভাগ্য দুঃখ, অনাহার ও বঞ্চনা। অবস্থার এমন ফের যে, যাহারা কিছুমাত্র শ্রম করিল না, উৎপাদনে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না, নানা ভোগ-বিলাস ও ফন্দি-বাজীতে দিন কাটাইল, তাহাদের আহার ও বিলাসের উপকরণ সঞ্চিত হইল, অপব্যয়ের অভাব হইল না। আর যাহারা জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া শস্য উৎপাদন করিল, তাহাদের পুত্রকন্যা না খাইয়া মরিল, তাহাদের পরণের বস্ত্র জুটিল না, আর লাভ হইল অপরের গালাগালি এবং তাড়না। ইহাতে যদি মনে বিদ্বেষের ভাব না জাগে, তবে আর কিসে জাগিবে। অজন্মা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, কিন্তু, জমিদারের পেয়াদা অনুপস্থিত হয় নাই, কর্ম্মচারীর কড়া শাসন শিথিল হয় নাই; মহাজনের সুদের হার কমে নাই, ভিটামাটি বিক্রয় বন্ধ হয় নাই। নিরুপায় হইয়া মানুষ এসকল সহ্য করিয়াছে। তাই বলিয়া মনের উপর ইহার অবশ্যম্ভাবী যে-ফল তাহা কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবার যে-দুঃখ, নিজেদের শ্রমলব্ধ জিনিষ অপরের কবলিত হইতে দেখিবার যে-মর্ম্মবেদনা, অপরের শোষণের নিরুপায় পাত্র হইবার যে-দুঃসহ অবস্থা, অনেক বৎসর ধরিয়া তাহা মুসলমান-কৃষকদিগের মনে জমা হইয়া, কিছুদিন হইতে স্বার্থবিশিষ্ট লোকদিগের ভুল পরিচালনায় হিন্দু-বিদ্বেষের আকারে দেখা দিয়াছে। যে-বিরোধ প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিক, তাহার একদিকে প্রধানত হিন্দু ও অন্যদিকে প্রধানত মুসলমান আছে বলিয়া, সেই অর্থনীতিক বিরোধকে নানা কৌশলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত করা দুষ্ট লোকদিগের পক্ষে সহজেই সম্ভব হইয়াছে।

অর্থনীতিক এই কারণটা, সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকারে দেখা দেওয়ার পথে অবশ্য আরও মাল-মসলার যোগান পাইয়াছে। কোনো

কারণে যখন আমাদের কাহারও উপর আক্রোশ হয় তখন আমাদের মন নিবিষ্টভাবে সেই কারণটিকেই তলাইয়া দেখিতে পারে না, অথবা আমাদের মনের আক্রোশ ধরা-বাঁধাভাবে সেই কারণের সীমারেখার মধ্যেই আবর্তিত হয় না। বরং সেই লোকের বাহিরের হাবভাব, চালচলন, এমন কি কথা-বার্ত্তা, পোষাক পরিচ্ছদের ধরণ পর্য্যন্ত লোকের মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। এই দেশের কৃষক এবং কায়িক শ্রমিকদিগের মনে ধনী এবং অভিজাতদিগের বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল, তাহাতে প্রথমোক্তেরা এই কথা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই যে, তাঁহাদের অভিযোগ অর্থনীতিক। তাঁহারা চোখের সামনেই দেখিতে পাইলেন যে, যাহারা তাঁহাদের উপর অন্যায় করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য হইতেছে ধর্ম্মের। এই কথা বুঝাইয়া দেওয়ারও লোক জুটিল যে, অপর পক্ষের ধর্ম্ম ইহার জন্য দায়ী। অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে ধর্ম্মের প্রভাব শক্তিশালী বলিয়া এইরকম ধারণা গড়িয়া উঠা এবং স্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছে।

ঐতিহাসিক কারণের সঙ্গে যদি এই অর্থনীতিক কারণের যোগাযোগ না ঘটিত তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এত বড় সাম্প্রদায়িক ব্যবধান গড়িয়া উঠিতে পারিত না। আর্থিক বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও বিদ্বেষ যেমন হ্রাস পাইল না—তেমনি পার্থক্যের অনুভূতি সাম্প্রদায়িক হইয়াছে বলিয়া অন্যান্য অভিযোগও দেখা দিয়াছে সাম্প্রদায়িক আকারে। মুসলমান কৃষকদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার ও দলের যে-চেতনা ছিল, তাহার ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম। এই কারণে ইঁহারা নিজেদের অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র দল বলিয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা মুসলমান আর অন্যেরা মুসলমান নহেন। ইহা অবশ্য আশা করা যায় যে, ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া এই-যে দলের চেতনা, ইহা

রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক, জাতীয়তা প্রভৃতির চেতনার উন্মেষের সঙ্গে হ্রাস পাইতই। কিন্তু, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একত্ববোধের ফলে যে দলের সৃষ্টি হইল তাহাতে এমন একটি কারণের সংযোগ ঘটিল, যাহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ঠিক এই দলটিই গড়িয়া উঠিতে পারিত। ইহার অপরিহার্য্য ফল দাঁড়াইল এই যে, পরবর্ত্তী কারণে দলটি দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিল বটে কিন্তু ইহা অনুভূতির দিক দিয়া এই দলটির ধর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধকেই তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল। মুসলমান-কৃষক হিন্দু-অভিজাতদিগের ব্যবহারে যতই বিরক্ত হইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুর দ্বারা নির্য্যাতিত হইতেছে। অর্থ-ক্ষমতার যে ঔদ্ধত্য তাহা মুসলমান-কৃষকদিগের প্রতি হিন্দু-অভিজাতদিগের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মুসলমান-কৃষকরা ইহাকে মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুদিগের অবজ্ঞা মনে করিয়া ভুল করিতে লাগিলেন। লোকের ধর্ম্মানুরক্তিকে ভাঙ্গাইয়া খাওয়া যাহাদের অভ্যাস তাহারাও মুসলমান-কৃষকদের অর্থনীতিক অসন্তোষকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে এবং অর্থনীতিক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপান্তরিত করিতে বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে।

মুসলমান-কৃষকদিগের মধ্যে যখন এই ভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে, কায়েমী-স্বার্থবিশিষ্ট হিন্দুদিগের মধ্যেও সেইভাবে আর্থিক স্বার্থবোধ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবোধের আকারে দেখা দিয়াছে। যেসব কার্য্য-কারণের প্রতিক্রিয়ার ফলে মুসলমানদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-স্বার্থবিরোধ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে, তাহা হিন্দুদিগের মনোভাবকে সমানই প্রভাবিত করিয়াছে। কায়েমী স্বার্থসমূহ রক্ষার দ্বারা যাঁহারা উপকৃত হইতে পারেন তাঁহারা অধিকাংশই হিন্দু বলিয়া এই প্রকার স্বার্থকে

হিন্দুদিগের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বলিয়া মনে করেন। অর্থ এবং সম্পত্তি হাতে থাকার ফলে ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষার যে-প্রসার ঘটিয়াছে, জীবন-যাত্রার মান যতটা উচুঁ হইয়াছে ; সভ্যতা, কৃষ্টি, বুদ্ধি প্রভৃতির যে উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহাকে ইঁহারা হিন্দুদিগের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অন্যদিকে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য যে-মানুষকে হীন, অজ্ঞ, ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়াছে, হিন্দুরা তাহাকে গভীর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাজাত এই সকল দোষকে মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। পরস্পরের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া পরস্পরের উপর ফলিয়াছে এবং দুইকেই অধিকতর সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আর্থিক অবস্থার এই অদ্ভুত সমাবেশের ফলে যখন দুই পক্ষেরই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি শানিত হইয়াছে, তখন-যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নানাপ্রকারে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কী ? এই সব ধাঁধায় পড়িয়া হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তেরা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন ; হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া তাহাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। যখন মুসলমান শ্রমিক, কৃষক ও দরিদ্র লোকেরা এবং হিন্দুদিগের ঐ পর্য্যায়ের লোকেরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা নিজেদেরই স্বার্থ নষ্ট করেন এবং যাহাদের পরামর্শক্রমে এই কাজ করেন, আসলে তাহাদেরই স্বার্থসিদ্ধ করেন।

এই প্রসঙ্গে অনুন্নত হিন্দুদিগের কথাও কিছু বলা যাইতে পারে। ইঁহারাও মুসলমানদিগের মতো অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হইয়াছেন ; এবং তাঁহাদের মনেও বর্ণ-হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে একই কারণে অসন্তোষ সঞ্চিত হইয়াছে। এই অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িক খাতে লইয়া যাওয়ার লোকও

জুটিয়াছে এবং তাহাদের চেষ্টা অনেকটা সফলও হইয়াছে। তাহা হইলেও প্রশ্নটা এখানে এতটা তীব্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ, এই অসন্তোষ ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধর্ম্মের অন্তরালে কিছু পরিমাণে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। হিন্দুস্বার্থ, হিন্দুর সভ্যতা-সংস্কৃতি, হিন্দু-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি কথার মোহে হিন্দু-জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে; আর ইহার ফলে অসন্তোষও ততটা তীব্র হইতে পারে নাই। অভিজাত হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে মুসলমান-কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর যে-অসন্তোষ আছে সেইটা যখন সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হইল, তখন ধনী, নির্ধন, উন্নত, অনুন্নত নির্ব্বিশেষে সব হিন্দুই তাহার আক্রমণের লক্ষ্য হইলেন; হিন্দুদিগের যাঁহারা ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিতেছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের সুবিধা হইয়া গেল। ইহাতে তাঁহারা অন্যান্য কথার সঙ্গে হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রশ্নের কথাটাও জড়াইয়া দিতে পারিলেন এবং হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরে সাম্প্রদায়িক মনোভাবটাকে কিছু পরিমাণে ছড়াইয়া দিতে সক্ষম হইলেন। সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের অনুভূতি ইহার ফলে অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, তবু এই ব্যাপারে তাঁহারা পুরাপুরি সফল হন নাই এবং অনুন্নত হিন্দুদিগের মধ্যেও উপ-সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার কিছু ঘটিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনীতিক অসন্তোষের সাম্প্রদায়িক রূপান্তর

অর্থনীতিক অসন্তোষ যেভাবে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা অন্যান্য যেসব অবস্থার আনুকূল্য পাইয়াছে তাহাও এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের শাসকবর্গ এবং তাঁহাদের অনুগৃহীত সুবিধাভোগীরা এবিষয়ে কতখানি দায়ী তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদেশের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য এদেশীয় লোক সংগ্রহের প্রয়োজন হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে এখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিতে হয়। মুসলমানেরা তখন অভিমানবশত ইংরাজী শিক্ষা বর্জ্জন করেন এবং এই শিক্ষার সুযোগ তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারাই গৃহীত হয়। মুসলমান সমাজের তৎকালীন অভিজাত ও মধ্যবিত্তেরা ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকেন। অনুন্নত হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিলেন। ফলে, শিক্ষা, আর্থিক-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির দিক দিয়া তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন।

সুবিধাগুলি একটা ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় নানাদিক দিয়া তাঁহাদের কিছু কিছু উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু, ইহার অন্য একটা ফলও সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। সুবিধাগুলা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনে এই ধারণা হইল যে, সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা বঞ্চিত হইতেছেন। ইহাতে সম্প্রদায় হিসাবেই সুবিধা দাবী করিবার কথা তাঁহাদের মনে খেলিতে লাগিল। ইঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে-পথ ধরিয়া উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি সেই পথে যাত্রা করিতে পারেন, তাঁহাদেরও উন্নতি হইবে। ইঁহাদের মধ্যে যতই শিক্ষার বিস্তার হইতে লাগিল এই ভাবটা ততই বাড়িতে লাগিল। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নূতন শিক্ষিতেরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

অবশ্য এই সম্পর্কে প্রধান কথাটা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। এই সুবিধাগুলির সংখ্যা ও পরিমাণ এত কম যে, একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন ইহা সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন কোনো কোনো দিক দিয়া ইহা সেই সম্প্রদায়ের অনেক লোকের উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়াছিল এবং সম্প্রদায়ভুক্ত বেশীর ভাগ লোক দরিদ্র থাকিয়া গেলেও তাহার একটা উন্নত চেহারা আনিয়া দিয়াছিল। তাই বলিয়া সমগ্র দেশের অধিবাসীদিগের উন্নতিবিধানে সমভাবে সহায়তা করিবার ক্ষমতা ইহার নাই। বরং যে-ব্যবস্থার ফলে বেশীরভাগ লোকের এই দুঃখ, দুর্দ্দশা, বঞ্চনা, অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্য, ঘটিয়াছে, সেই ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্যই স্বল্পসংখ্যক লোক এইসব সুবিধা পাইয়াছে। এইজন্য বেশী জনে এই সুবিধা স্বভাবতই লাভ করিতে পারে না; সুতরাং দেশের বৃহৎ জনগণের সহিত ইহাদের স্বার্থের সম্পর্ক তো থাকিতেই পারে না—বরং

বিরোধই আছে। যদি ইঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদের এই জনস্বার্থ-বিরোধী চরিত্র জনগণের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। কিন্তু, ঘটনাক্রমে একটা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ইঁহারা উদ্ভূত হওয়ায় সমস্ত-কিছু অসুবিধার দায়িত্ব ঐ সম্প্রদায়ের ঘাড়েই লোকে চাপাইবার সুবিধা পাইয়াছে।

এইভাবে ইন্ধন পাইয়া সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা যখন প্রবল হইয়া উঠিল, আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে এই অবস্থাকে কাজে লাগাইবার প্রয়োজনও তখনই দেখা দিল। তাঁহারা যে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন তাহাও এখানে বিবেচনার যোগ্য। সব জিনিষেরই দুইটি বিপরীত দিক আছে। একদিকে যেমন এই সুবিধাভোগীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সব চাইতে বড় সমর্থক হইয়াছেন, তেমনি এই সুবিধাদানের ব্যবস্থা সুবিধাভোগীদিগের মধ্যে অসন্তোষের বীজ উপ্ত করিয়াছে। এই দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য। কিন্তু, এই শিক্ষা শুধু উক্তপ্রয়োজনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; তখন তাঁহাদের সকলের পক্ষে সরকারী বা অন্যবিধ চাকরী পাওয়া স্বভাবতই সম্ভব হইল না। বিদ্বজ্জনোচিত, যে-সব ব্যবসায়ে অনেক টাকা রোজগার হইত এবং চাকরীর সঙ্গে যেসব ব্যবসা ইংরাজী শিক্ষার প্রধান প্রলোভন স্বরূপ ছিল, তাহার পথও ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। অথচ, যাঁহারা ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন তাঁহাদের মনে অনেক বড় বড় আশা থাকিয়া গেল—সামনে থাকিল তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের জীবনযাত্রার উচ্চমান। ইঁহাদের বেশীর ভাগের পক্ষে সরকারী বা বেসরকারী চাকরী, পদমর্য্যাদা

লাভ ঘটিল না ; বা অন্য রকম আয়ের পথও প্রশস্ত হইল না। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিল ; নানা দুঃখ, দুর্দ্দশাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষিতের এই অভিমান রাজনীতিক অসন্তোষের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতীয় জাগরণের প্রেরণা যোগাইয়া দিল ; এবং রাজনীতিক পরাধীনতাই-যে ব্যাপক দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ, এই কথা জনগণের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে রাজনীতিক চেতনা জাগিয়াছে, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে এইটাই একটা শক্তিশালী কারণ।

ইঁহাদের এই-যে নূতন মনোভাব, এটা শুধুই সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী মনোভাব নয় ; দেশের জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দেশের মধ্যে ইঁহারা যে-আন্দোলন সুরু করিলেন তাহা আরও ঠিক পথে চালিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে ইঁহাদের সংযোগ ঘটিত এবং সাম্প্রদায়িকতার পথ বন্ধ হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই-যে অন্তর্বিরোধ এটা জনসাধারণের চোখে পড়িল না। এই নূতন দলের স্বতন্ত্ররূপটা তাঁহাদের কাছে ধরা পড়িল না। তাঁহারা মনে করিলেন জনসাধারণকে ঠকাইবার জন্য সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের ইহা আর একটা কৌশল। এই নূতন দলের যে আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা, তাহার মধ্যেই ইহার কারণ নিহিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন ধনীরা ; আর এই আন্দোলনের শক্তি ও উৎস ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা। ধনীদের উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের স্বার্থপুষ্টির জন্য স্বদেশী ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটানো ; মধ্যবিত্তদের উদ্দেশ্য ছিল, দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটানো ও উচ্চতর জীবযাত্রার পাথেয় লাভ। ইঁহাদের সম্মুখে আদর্শ ছিল পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ; এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার

আদর্শেই ইঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও শোষণ-ব্যবস্থার অবসানের কোনো আশ্বাস ছিল না : এবং জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে এই আন্দোলনের কোনো সংযোগ-সেতুও জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। ক্ষমতার হস্তান্তর হইলে বর্তমানের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের হাতেই তাহা পড়িত। জনসাধারণের তাহাতে-যে কোনো হাত থাকিত না, এই কথা স্পষ্টভাবে হউক বা অস্পষ্টভাবে হউক, বুঝা গিয়াছিল বলিয়াই জনসাধারণ এই আন্দোলনের দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় নাই।

এইসব আন্দোলন হইতে বিটিশ কূট-রাজনীতিকগণ তাঁহাদের বিপদের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং জনশক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত রাখিবার কৌশল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতে যে-সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং তাহার সহিত সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা বর্তমান ছিল, তাহাকেই কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইল। সুবিধা ও পদমর্য্যাদাগুলির বণ্টনের ভিত্তি সাম্প্রদায়িক করিয়া দিয়া বিটিশ রাজনীতিকগণ, সাম্প্রদায়িক সীমারেখাগুলি স্পষ্টতর করিয়া তুলিলেন। সুবিধালাভের জন্য যে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি অনেক পাকা হইয়া উঠিল। নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইতে লাগিলেন, সাধারণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাফল্য লাভের আশা নিতান্তই ক্ষীণ ছিল। এখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরী ও অন্যান্য সুবিধার বণ্টন হওয়ায় ইহারা খুব সুবিধা পাইয়া গেলেন। প্রত্যেক লোকই মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিজের সুবিধালাভের আশা একমাত্র নির্ভর করিতেছে তাঁহার নিজ সম্প্রদায় কতটা সুবিধা পাইবে তাহার উপর। সুবিধা-প্রত্যাশীদের একমাত্র চেষ্টা হইল, তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় যাহাতে

অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা পায়, তাহার জন্য আন্দোলন করা। লোকের দৃষ্টিমান সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু প্রতিযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হইল। এই কোলাহলে, লোকে ভুলিয়া গেল—চাকরী এবং পদমর্যাদা সূচক পদের সংখ্যা খুবই অল্প, আর সব সম্প্রদায়েরই মাত্র অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তাহা লাভ করিতে পারিবেন। বেশীরভাগ লোকেরই দুঃখের কোনো অবসান ইহাতে হইবে না; বরং যে জাতীয় ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সকলের দুঃখ দূর হইতে পারিত সেই সকল আন্দোলনের শক্তি ইহার দ্বারা ব্যাহত হইবে।

জনমতকে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা দলের নেতৃত্বাধীনে রাখিবার পক্ষে ইহাতে খুব চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে। আগে সুবিধাগুলি একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সুবিধালাভের মূল্যে তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের নিকট জাতীয় স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছিলেন। বর্তমান ব্যবস্থায় সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুবিধাভোগীদের দল দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বের সুবিধাভোগীরা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের লোককে প্রভাবিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু, এখন সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই কিছু কিছু লোক সুবিধাভোগী হওয়ার সুযোগ পাইতেছে বলিয়া, এইসব লোকের জাতীয়তা ও প্রগতি-বিরোধী প্রভাব সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতেছে। চাকরী অথবা ক্ষমতার যেসব পদের জন্য লোক সংগৃহীত হয়, তাহাতে প্রবেশলাভ করিবার জন্য সব যোগ্য ব্যক্তি চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় সাফল্য লাভের প্রথম সোপান হইতেছে, যাহাতে এই আসন, বা আসনগুলার একটা বড় অংশ, চেষ্টাকারীর নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বণ্টিত হয়, তাহার ব্যবস্থা

করা ; এবং যাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া সেগুলো না পড়ে তাহার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব জোর আন্দোলন করা। সব সম্প্রদায়ের সুবিধা-প্রত্যাশীরাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই চেষ্টা করিতেছেন এবং সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা যাহাতে তাঁহাদের কথার প্রতিধ্বনি করেন তাহার জন্য নিরলসভাবে সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন। যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা জোট বাঁধিয়া তাঁহাদের জন্য এইসব পদের প্রার্থনা জানান, আর সাম্প্রদায়িক সীমারেখা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন কোনো আন্দোলনে যাহাতে যোগ না দেন, সেজন্যও তাঁহাদের চেষ্টার বিরাম নাই।

সুবিধা-প্রত্যাশীরা জানেন যে, জনসাধারণ যদি অর্থনীতিক ও রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করে, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণের স্বার্থ এক ও অখণ্ড ; এবং সে স্বার্থ কয়েকজন লোক চাকরী বা পদমর্য্যাদা পাইলেই সিদ্ধ হইবে না। তাহারা তখন একথাও বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের স্বার্থ যাহারা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছে, এই সুবিধান্বেষীরা তাহাদেরই অনুগ্রহপুষ্ট। ইঁহারা ব্যক্তি-স্বার্থকেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে চালাইতেছেন ও সকল সম্প্রদায়েরই কল্যাণের পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছেন। এইজন্য সুবিধাভোগীরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, এতদিন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কোনো সুযোগ সুবিধা পাইতেন না, কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা অপহরণ করিয়া বসিয়াছিল ; এখন সরকারের অনুগ্রহে তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এমন দয়ালু ও ন্যায়বান সরকার যাহাতে রুষ্ট হইতে পারেন, এমন-সব কাজ হইতে যাহাতে সবাই দূরে থাকে সেজন্য বিশেষভাবে সকলকে সাবধান

করিয়া দেন। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের এই সকল চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই মনে করিতেছেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে দুই-চারজনের সুবিধা লাভের দ্বারা তাঁহাদের সমগ্র সম্প্রদায় লাভবান হইবেন। কোনো সম্প্রদায়েরই সাধারণ লোকেরা যে ইহাতে লাভবান হইতেছে না, আর যে-পথে যাত্রা করিলে সকলেরই লাভ হইতে পারিত, প্রতি সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীরা-যে জনসাধারণকে সেই পথ হইতে এই কৌশলে নিবৃত্ত করিতেছেন—সুবিধাভোগীদের স্বার্থপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের ফলে সেই কথা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রের আওতায় যাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে, এই রাষ্ট্রের নিকট হইতে যাঁহারা সুবিধার প্রত্যাশী, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধ অপরিহার্য্য। কারণ, বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুকূল পরিবর্ত্তনেই জনসাধারণের স্বার্থ ; আর সেই চেষ্টা হইতে তাঁহাদের বিরত রাখাতেই সুবিধাভোগীদের স্বার্থ। সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই যাহাতে সুবিধাভোগীদের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা যাহাতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দোহাই দিয়া জনসাধারণকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে পারেন বা বিপথে চালিত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতি পরিকল্পিত হইয়াছিল। সে পরিকল্পনা সফলও হইয়াছে। দেশে সাম্প্রদায়িকতার পুষ্টি হইয়াছে এবং তাহা আত্মকলহের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে অলক্ষিতে—কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে, আত্মঘাতের পথে লইয়া চলিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনীতিক অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িক রূপদানের কৌশল

আমাদের দেশের কৃষক, শ্রমিক ও দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার ও অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই। অথচ, তাঁহারা ইহার কারণ ও প্রতিকারের সঠিক উপায় অবগত নহেন। তাই তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি কেহ সহানুভূতি দেখাইলে, তাহার প্রতি ইঁহাদের ঢলিয়া পড়া এবং তাহার দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক।

মুসলমানদিগের অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমিক,—সকলেই দরিদ্র। সাম্প্রদায়িক নেতারা সভায় বৈঠকে এঁদের দারিদ্র্য ও অভাবের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন, শ্রোতারা সচেতন হইয়া প্রতিকারের পন্থা চায়,—বক্তা-নেতা তখন প্রতিকারকল্পে মুসলমানদিগকে সম্প্রদায় হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন। ইহার প্রত্যাশিত ফলও ফলে। অবস্থার বর্ণনা ও যুক্তি ঠিকই দেওয়া হয়, তাই সিদ্ধান্তের ভুল লোকে ধরিতে পারে না। লোকে দলের কথা সম্প্রদায় হিসাবেই ভাবিতে শিখিয়াছে; তাহারা চিরদিন জানিয়াছে, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান। কাজেই সভায় উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মুসলমান কৃষক ও দরিদ্রেরা ভুলিয়া যান যে, বর্ণিত দুঃখ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল কৃষক ও দরিদ্রেরই

দুঃখ। সমাজে অর্থশালী লোকদিগের দ্বারা দরিদ্রের উপর, জমিদার, বা মহাজন প্রভৃতির দ্বারা প্রজা বা খাতকদিগের উপর যেসব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলকে মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচার বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঁহারা একদিকে যেমন সমদুঃখী এবং সমস্বার্থবিশিষ্ট হিন্দু কৃষক ও দরিদ্র লোকদিগের দুঃখের কথা ভুলিয়া যান ; তেমনি ইহাও ভুলিয়া যান যে, মুসলমান মাত্রেই কৃষক বা দরিদ্র নহেন আর অকৃষক ও সুবিধান্বেষী মুসলমানেরা কৃষক ও দরিদ্র মুসলমানদিগের দুঃখের অংশভাগী নহেন। এইরূপে যাহার জন্য হিন্দু-মুসলমান কৃষক-মজুর শ্রেণীর দরিদ্রদিগের এক সঙ্গে জোট বাঁধা উচিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা ধারণা দূরীভূত হইয়া সমস্বার্থের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠা উচিত ছিল, তাহারই ফলে সাম্প্রদায়িকতা দানা বাঁধিয়া উঠে।

এই-যে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলা হয়, ইহার মধ্যে কতকগুলা কর্ম্মপন্থারও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমত, শিক্ষার জন্য কিছু পরিমাণ মামুলি উপদেশ থাকে। যাহাদের দুই বেলার অন্নের সংস্থান নাই, শিশুকাল হইতেই যাহাদের উপার্জ্জনের জন্য সন্তানদিগকে না খাটাইয়া উপায় নাই, তাদের পক্ষে শিক্ষার কথা কঠোর পরিহাস মাত্র। শিক্ষার কোনো রকম পরিকল্পনার দ্বারা-যে ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব নহে, শিক্ষালাভের জন্য আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকার-যে সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজনীয়, সেই কথা লোকে ঝোঁকের মাথায় বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে শিক্ষালাভ করিতে না পারাটা যেন তাহাদের নিজেদের দোষ, এইজন্য কাহাকেও দায়ী করিবার কিছু নাই, আর তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুর্গতিও ঘটিতেছে বুঝি শিক্ষালাভ করিতে না পারিয়াই। দারিদ্র্যই যে অশিক্ষার জন্য দায়ী এবং দারিদ্র্যের জন্য দায়ী-যে প্রচলিত আর্থিক বিধান,

সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া লোকে ফলকেই কারণ বলিয়া ধরিয়া লয়—অশিক্ষাকেই দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া মনে করে।

তাহার পরই বলা হয়, মুস্‌লিম লীগের চেষ্টায় মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা আসিতেছে বলিয়া মুসলমান জনসাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে কিন্তু, তাহার প্রধান বাধা হইতেছে সম্প্রদায়-বিশেষের লোকেরা। মুসলিম সাধারণের বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, সামাজিক সংহতি বাড়াইবার জন্য এমন আন্দোলন করিতে হইবে যাহাতে চাকুরি এবং ক্ষমতা মুসলমানদিগের হাতে বেশী করিয়া আসে। হিন্দুদিগের মুসলমান বিদ্বেষের কথা ফলাও করিয়া বলা হয়। সমস্ত সরকারবিরোধী আন্দোলনকে বলা হয়, আসলে এসব ছদ্মবেশী মুসলিমবিরোধী আন্দোলন। মুসলমানেরা ক্ষমতা ও সুবিধা পাইতেছে বলিয়া, হিন্দুরা এসব আন্দোলন করিতেছে এবং মুসলিম সাধারণকে এইভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে। সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে এইসব কথাকে লোকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। যেসব উদাহরণ দেওয়া হয় তাহা অবশ্য নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের মুসলমান সমাজের ২।৪জন সুবিধাভোগী বা চাকুরের। ২।১জন বড় বড় লোকেরও নাম করা হয় আর বলা হয়,—এই সবেমাত্র আরম্ভ ! এতদিন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসমানদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, এইবার মুসলমানদিগের সচেষ্ট হইয়া এইসব ছিনাইয়া লইতে হইবে ; তাহা হইলেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা সব দূরীভূত হইবে। ইঁহাদেরই সমাজের অগ্রগামী দল বলিয়া বর্ণনা করা হয় আর তাঁহারা যাহাতে বীরের সম্মান পান, তাহার জন্যও যথোচিত প্রচারকার্য্য করা হয়। দরিদ্রদিগের যেসব দুঃখ-দুর্দ্দশা-অপমান নিত্য সহ্য করিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হয়—এই ছিল মুসলমান সমাজের এতদিনের ভাগ্য কিন্তু, আজ অবস্থার

পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। যাহারা এতদিন তাহাদের ঘৃণা করিত, আজ তাহারা তাহাদের সম্মান করিতে, খাতির করিতে, ভয় করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক অভিমান তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে—এতদিনের বঞ্চনার ক্ষোভ, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে তৃপ্তির সুযোগ পায়। সাম্প্রদায়িক অনুভূতি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে বলিয়া লোকে মনে করে, এইসব নূতন সুবিধাভোগীরা হইতেছেন নিপীড়িত মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি এবং সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়াই তাঁহারা সুবিধা সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। ইঁহাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা বলিতে যাইবেন তাঁহারা মুসলিম সমাজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে বলিবেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া লয়। এইভাবেই অজ্ঞ জনগণের আর্থিক অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলা হইতেছে।

কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মুসলমানদিগের উপর নানারকম অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী বলা হয়; এবং মুসলমানেরা দল বাঁধিতে না পারিলে-যে কংগ্রেসের মারফৎ হিন্দুরাই রাজত্ব দখল করিয়া বসিবে এবং তাহাতে মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্ম সবই পণ্ড হইবে, জনসাধারণের মধ্যে এমন আশঙ্কা ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। হিন্দু সভার বড় বড় চাঁইরা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলেন, তাহাতে আরও রং চড়াইয়া দেখানো হয়—মুসলমানেরা কতবড় বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই সব উক্তির দ্বারা-যে সমগ্র হিন্দু সমাজের মনোভাব ব্যক্ত হয় না; এটা-যে সুবিধান্বেষীদিগের উক্তি মাত্র, তাঁহারাও-যে এইভাবে নিজ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন, এই কথা বুঝিবার সুযোগ সাধারণ লোকে পায় না। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের কল্যাণকামী এমন বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই সব ফাঁদে

পড়িয়া যান। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার অবসানে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও সাম্প্রদায়িক নেতাদিগের উক্তি ও অসঙ্গত দাবী দেখিয়া মনে করেন, আর হিন্দুদিগের সহিত মিলনের আশা থাকিল না। কিন্তু, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ হিন্দু এ কথা বলেন নাই বা এই মনোভাব পোষণ করেন না। যাহারা একথা বলিতেছে তাহারা নিজেদের মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে সংক্রমিত করিতে চাহিতেছে মাত্র। আবার যখন ইহার প্রত্যুত্তরে কোনো মুসলিম নেতা সমগ্র মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব নিজহাতে গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে উক্তি করেন ও মুসলমানদের কল্পিত স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলো অসঙ্গত প্রস্তাব করেন, তখন হিন্দুদের উপরও আবার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাঁহারাও ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা বা বৃহৎ মুসলমান সমাজের বিপুল সংখ্যক লোকেরা এই উক্তি করেন নাই। এই প্রকারের কথা যাহাতে মুসলমান জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পারে সেইজন্যই সাম্প্রদায়িক নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক নীতির ইঙ্গিতে সময় বুঝিয়া ইহা বলিয়াছেন। ইঁহাদের এই কৌশলের সাফল্য একান্তভাবে নির্ভর করে হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার উপর। কেননা ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা তর্ক বিতর্ক, আক্রোশ ও কটুক্তির মধ্যে সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এই সব মিলিতভাবে মুসলমান-সাধারণের মধ্যে এমন মনোভাবের সৃষ্টি করে, যাহাতে তাহারা মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের উক্তিকে সময়োপযোগী বলিয়া এবং দাবী সর্ত্ত প্রভৃতিকে যুক্তি-সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করে। এইরূপে অর্থনীতির মধ্যে যাহার ভিত্তি, নানাপথে ও নানাভাবে তাহার সাম্প্রদায়িক পরিণতি ঘটিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িক নেতারা বৃটিশ সাম্রাজ্যিক নীতির হাতে খেলনা হিসাবে কীভাবে কাজ করিয়াছেন তাহার সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক ধ্বনির সহায়তায় যাঁহারা ক্ষমতালাভ করিয়াছেন তাঁহারা লোককে এই কথা বুঝাইতেছেন যে, অনেক কষ্ট করিয়া তাঁহারা মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন আর তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া, এতদিন যাহাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তাহারা বিরুদ্ধতা করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহারা যে সকল প্রতিক্রিয়াশীল কাজ করিতেছেন আসলে তাহা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমগ্র জনগণের স্বার্থবিরোধী হইলেও,এবং তাহা সাম্রাজিক নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও, আপাতদৃষ্টিতে এই উচ্ছিষ্টের ভাগাভাগিতে মুসলমানদের কিছু বেশী সুবিধা দেওয়া হইয়াছে (অন্তত হিন্দুদের চোখে)। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কাজের বিরুদ্ধে যাহা-কিছু আন্দোলন হোক, তাহাকে ইসলাম-বিরোধী আন্দোলন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় ; আর তাহার জন্য প্রতিক্রিয়া-বিরোধী আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না এবং জনগণের মধ্যেই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা গড়িয়া উঠিতে থাকে। আবার অন্যপক্ষের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনও ইহার সহিত মিলিয়া যায়।—হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা এতদিন সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সুবিধা কতকটা কমিয়া গেলে তাঁহাদের দৃষ্টি সেইদিকেই পড়ে। তাঁহারাও এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি হইতেই আন্দোলন আরম্ভ করেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই প্রকৃত স্বার্থহানিটা-যে কোথায় তাহা ইহারা দেখিতে পান না। ফলে সমগ্র জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা চাপা পড়িয়া যায় এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন একেবারেই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে।

যেসব মানুষের আর্থিক চেতনা একটু তীব্র ও প্রত্যক্ষ সেখানেও সাম্প্রদায়িক নেতারা ভুল যুক্তির সাহায্যে ইহাকে সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। মুসলমান কৃষকদের কাছে ইঁহারা খুব হামেশা একটা ভুল যুক্তি দিয়া থাকেন। কৃষকদের অধিকাংশ যখন মুসলমান, আর মুসলমান সমাজের অধিকাংশের জীবিকা যখন কৃষি, তখন মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হইবে—এই কথাই ইঁহারা বলেন। যদিও এই কথা বলা ঠিক হইত যে, কৃষকদের অধিকাংশ যখন মুসলমান, এবং মুসলমানদের অধিকাংশ যখন কৃষক, তখন কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হইলে ও তাঁহাদের উন্নতি হইলে, মুসলমান সমাজের অধিকাংশের উন্নতি হইবে।

বাংলার কৃষিজীবীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইলেও অ-মুসলমান কৃষকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। যদি এমন হইত যে, কৃষকদের মধ্যে অ-মুসলমান নাই, অর্থাৎ সব কৃষকই মুসলমান, তাহা হইলে মুসলিম ঐক্যের মধ্য দিয়া কৃষকদের উন্নতি হইবে—একথার মধ্যে খানিকটা অন্ততঃ যৌক্তিকতা থাকিত। অবশ্য কথার যৌক্তিকতা ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনার যুক্তি অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, যদি এই দেশের কৃষকরা সবাই মুসলমান হইতেন, তাহা হইলেও মুসলিম ঐক্যের দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইত না। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দ্বারা ইঁহাদের শোষণের পথ প্রশস্ত হইত মাত্র। কেননা কৃষকেরা যদিও-বা সবাই মুসলমান হইতেন, মুসলমানেরা সবাই কৃষক হইতেন না—অ-কৃষক ধনী ও বুদ্ধিজীবী মুসলমানেরাও থাকিতেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থ কৃষকদের সহিত এক হইত না—বিরোধীই হইত। কিন্তু, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রলেপে এই স্বার্থের সংঘাত ঢাকা পড়িয়া যাইত ;

এবং কৃষকদের নেতৃত্ব গিয়া পড়িত কৃষক-স্বার্থবিরোধী উক্ত ধনী ব্যক্তিদের হাতে। কৃষকেরা পরিচালিত হইতেন নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং তাঁহাদের স্বার্থ-বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে। আর সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ফলে কৃষকদেরও এই বোধ ও চেতনা নষ্ট হইয়া যাইত যে, তাঁহারা কৃষক, এবং তাঁহাদের নিজেদের—তথা কৃষক-শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বার্থ আছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে কৃষক শ্রেণীর সমস্বার্থের কথা ভুলিবার ফলে অন্যান্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে প্রতিযোগিতা অথবা বিদ্বেষের ভাব জাগিত; ইহাতে কৃষকদের উন্নতিমূলক কোন ধারাবাহিক কর্ম্মনীতি বা কর্ম্মপন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিতেন না,—নানা ভূয়া জিনিষের পিছনে ছুটিয়া মিছামিছি শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করিতেন। সাম্প্রদায়িকতার মোহে মুসলমান কৃষক মুসলমান-জমিদারকে নিজের লোক ভাবিতেন; ইহাতে কৃষকদের স্বার্থ-সিদ্ধি না হইয়া তাঁহাদের স্বার্থহানিই ঘটিত।

কিন্তু শুধুমাত্র কৃষকেরা থাকিবেন, অথচ তাঁহাদের ঠকাইয়া শোষণ করিয়া নিজেরা পুষ্ট হইবে এমন লোক থাকিবে না, ইহা কোনো সমাজের পক্ষেই সম্ভব নহে। যদিও তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোনো একটা বিশেষ সময়ে এই অসম্ভব অবস্থা সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলেও একথা নিশ্চিত যে, শীঘ্রই সে-সমাজে শোষণ করিবার ও ঠকাইবার মতো লোক দেখা দিবে। যখনই এই কৃষক সম্প্রদায় ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল বাঁধিবেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে এই ইচ্ছা দেখা দিবে যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোক চাকুরি পাক, দোকান-পসার খুলুক, ডাক্তার উকিল হোক। এইসব শ্রেণীর লোক শীঘ্র দেখা দিবেন এবং তাঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকের উৎসাহ ও সমর্থন পাইবেন। ক্রমে জমিদার, মহাজন প্রভৃতিও দেখা দিবে। এই অবস্থায় কৃষকদের শ্রেণী-

স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা থাকিবে না এবং নূতন উদ্ভূত লোকেরা-যে কৃষকস্বার্থ-বিরোধী, সে কথাও তাঁহারা সহসা বুঝিবেন না। এই কথাটার একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এইজন্য হইল যে, অনেক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিও এই ভুল যুক্তির দ্বারা চালিত হইয়া অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

মুসলমান-কৃষকদের সম্পর্কে যে-কথা বলা হইল হিন্দু কৃষকশ্রেণী-সম্পর্কেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এখানেও অর্থনীতিক অসন্তোষকে উপ-সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া উপ-সাম্প্রদায়িক নেতারা জনসাধারণের স্বার্থের বিনিময়ে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুরা বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত,—ইহাদের কৃষক সম্প্রদায়গুলিও এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন। বৈবাহিক আদান-প্রদান, আহারাদি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটা করিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে ; আর শিথিল অর্থে এই জাতিগুলিকেই দল বলা যায়। হিন্দু-কৃষকগণও পৃথক শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পর্কে অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন বা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাঁহাদের সচেতন করা হইতেছে। দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকার স্বরূপ হিন্দুদের প্রত্যেক জাতির নেতাগণ নিজ নিজ জাতিকে সংঘবদ্ধ হইয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে বলিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের উপ-সাম্প্রদায়িক সীমারেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন তাঁহাদের এই বোধ বাড়িয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা অন্যান্য হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র ; তেমনই তাঁহাদের এই বোধও অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে যে, অন্যান্য জাতির হিন্দু-কৃষকদের ও মুসলমান-কৃষকদের সঙ্গে তাঁহাদের স্বার্থ ও ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত। ইঁহারা শুনিয়া আসিতেছেন, হিন্দু সমাজের একটা বিশেষ জাতির লোক

ইঁহারা ! আর এই বিশেষ জাতির উন্নতির উপরই নির্ভর করিতেছে ইঁহাদের উন্নতি। ফলে, অন্য সবকিছু ছাড়িয়া এই উপ-সাম্প্রদায়িকতার দিকেই ইঁহাদের ঝোঁক বাড়িতেছে।

বর্ত্তমানে আবার হিন্দু সভার তৎপরতায়-যে সমস্ত হিন্দুকে এক করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা এই সব লোকের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঐক্যের বন্ধন মুসলমান সমাজের তুলনায় অনেক শিথিল। কাজেই সমগ্র হিন্দু সমাজের পক্ষে একটা সাধারণ বিপদের কথা বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যবিধানের চেষ্টা চলিতেছে। ইহারা বলিতেছে, মুসলমানদের আচরণ সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া যেসব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব স্থানে—এমন আক্রমণমুলক হইয়া পড়িয়াছে যে হিন্দুরা যদি সবজ্ঘদ্ধ হইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাঁচাইবার উপায় নাই। ইহার ফলও কিছু ফলিয়াছে।

তাহার পর বিভিন্ন জাতির হিন্দুদের মনে বর্ণ-হিন্দুদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ আছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে উপ-সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রথম উদ্ভব হয়। সামাজিক অবিচার ও অমর্য্যাদার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সামাজিক মর্য্যাদা লাভের চেষ্টাই ছিল এই সবের ভিত্তি। ইহাতে হিন্দু-কৃষকসম্প্রদায়গুলির অসন্তোষ [যাহার ভিত্তিও আর্থিক] এই নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, আর ইহার ফলে অনেক লোকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, এইগুলি লাভ হইলেই বুঝি দুঃখদুর্দ্দশার অবসান হইবে। হিন্দুসাধারণের এই মনোভাবকে হিন্দু সভার নেতারা কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা ইঁহাদের সম্মুখে উদার সামাজিক আদর্শ ধরিয়া দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন ; এবং ইহাতে পূর্ব্বেকার আন্দোলনের অনেক নেতার সহায়তা পাইতেছেন।

তাহা হইলেও ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে, পূর্ব্বে যে উপ-সাম্প্রদায়িকতার কথা বলা হইয়াছে হিন্দু কৃষকদের উপর তাহারই প্রভাব বেশী। এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, হিন্দু সমাজের অন্যায় ও অপমানসূচক ব্যবস্থাসমূহ দূর হওয়া-যে প্রয়োজন তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আর্থিক দুর্দ্দশার সঙ্গে ইহাকে জড়াইয়া ফেলিয়া সব দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিলেই ভুল হয় ও ঠকিবার আশঙ্কা থাকে। বরং একথা বলা চলে যে, আর্থিক বৈষম্য দূর হইলে এই বৈষম্য আপনিই লুপ্ত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অন্যান্য কারণের প্রভাব—
অর্থনীতিক কারণের যোগাযোগ

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে যে অর্থনীতিক বিভাগের কথা বলা হইয়াছে তাহা সাধারণভাবে সত্য হইলেও সমগ্র ভারতের প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক প্রদেশ বা প্রত্যেক জেলার পক্ষে সত্য না হইতেও পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে সকল যায়গায় অর্থনীতিক বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগের সহিত মিলিত হয় নাই—সে সকল স্থানে সাম্প্রদায়িকতার পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দানা বাঁধিয়া উঠা স্বাভাবিক হয় নাই।

কিন্তু, এই সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণটি আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মূল নিহিত আছে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি যদি বিদ্যমান থাকে এবং তাহাকে কাজে লাগাইবার মতো শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ থাকে তাহা হইলে, নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে সক্রিয় করিয়া তোলা এবং তাহাকে প্রতিযোগিতা ও বিরোধের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলা অসম্ভব নহে।

যেখানে ইহা অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছে এবং অর্থনীতিক কারণের মতো শক্তিশালী কারণকে পক্ষে পাইয়াছে, সেখানে ইহার বৃদ্ধি খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। সেখানে ইহার মূল বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কত সহজে অর্থনীতিক ভিত্তির উপর সাম্প্রদায়িক বিরোধ আনিয়া দাঁড় করান যায় এবং কীভাবে-যে তাহা করা হইতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা দেখান হইয়াছে। অর্থনীতিক কারণের সহিত যুক্ত হওয়ায় বিরোধ ও প্রতিযোগিতা যেমন দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, যতই তীব্র ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, জনসাধারণ যেভাবে ইহার আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে,—অর্থনীতিক কারণের সহিত সংযোগ না থাকিলে ততটা সম্ভব হইত না, জনসাধারণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ততটা জটিল আকার ধারণ করিতে পারিত না এবং ইহার উচ্ছেদও হয়ত ততটা দুঃসাধ্য হইত না।

কিন্তু, অন্য কোন প্রকার কারণের সংযোগ না থাকিলেও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতিকে প্রভু-পক্ষীয়েরা বিরোধের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে পারেন। তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রদত্ত সুবিধা, অধিকার ও ক্ষমতার ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আনিয়া দিয়াছেন এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে জাগ্রত রাখিতে পারিলেই সাম্প্রদায়িক বিশেষ-অধিকারগুলিকে বজায় রাখা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিশেষ সুবিধা ও অধিকারের সুফল যাঁহারা ভোগ করিতে লাগিলেন তাঁহারা নানাবিধ সত্য ও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিবার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। নিজ

সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের অতিরঞ্জিত ও অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ গড়িয়া তোলা হইতে লাগিল। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তিগত বাদ-বিসম্বাদ, মন-কষাকষি অথবা স্বার্থের দ্বন্দ্বের মধ্যে যেখানে একপক্ষ হিন্দু ও অপর পক্ষ মুসলমান, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকার গ্রহণ করে। কিন্তু, যতদিন এই অবস্থাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাইবার মতো সুযোগ-সন্ধানী লোক না ছিল, ততদিন ইহা ছোট ছোট যায়গার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু, বর্ত্তমানে এই সকলকে পুঁজি করিয়া এবং ইহার অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রচার করিয়া ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ জাগান সম্ভব হইতেছে। চাকরীর লোভ দেখাইয়া অনেক লোকের দ্বারা যে এই ধরণের কাজ করান হইতেছে তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

সারা ভারতবর্ষের পক্ষে একটা কথা মোটামুটি সত্য। মুসলমানদের মধ্যে কোনো কোনো স্থানে বড় বড় ভূম্যধিকারী বা ক্বচিৎ দুই-একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী থাকিলেও, অগ্রিম ইংরাজী শিক্ষার অধিকারে সরকারি চাকুরি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে সামাজিক সম্মান প্রভুত্ব প্রায় সমস্তই হিন্দুদের হাতে আসিয়া পড়ে; অন্যদিকে মুসলমানদের মনে এইভাব জাগিয়াছে যে, সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা এইসব অধিকার হইতে বঞ্চিত। মুসলমানদের মনের এই বঞ্চনাবোধ বা ক্ষোভ পূর্ব্বসঞ্জাত সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেও অর্থনীতিক কারণকে অবলম্বন করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়াছে—যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অসন্তোষ ভূমি-ব্যবস্থার সহিত জড়িত নাই। একদিকে যাঁহারা বিশেষ সুবিধার বলে চাকুরি প্রভৃতি

পাইলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ সমাজ যেমন মর্য্যাদা ও উন্নতির অগ্রদূত বলিয়া মনে করিল, তেমনি যাঁহারা নূতন ব্যবসায়ী হইলেন, ডাক্তার হইলেন, উকিল মোক্তার হইলেন, তাঁহাদিগকেও প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাম্প্রদায়িক শ্লোগান কিছু কিছু দিতে হইয়াছে। ইঁহারা পরোক্ষ অর্থনীতিক অসন্তোষকে কাজে লাগাইয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা প্রচার করিয়াছেন যে, এই প্রকার সাম্প্রদায়িক পথে অগ্রসর হইয়া মুসলমানদের উন্নতিলাভ করিতে হইবে।

ভূসম্পত্তিগত অর্থনীতিক বিভাগের সহিত সাম্প্রদায়িক বিভাগের যে-মিলের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা সমগ্র ভারতের সর্ব্বস্থানের পক্ষে সত্য না হইলেও ভারতের বেশীর ভাগ স্থানের পক্ষে সত্য— বিশেষতঃ মুসলমান অধ্যুষিত প্রধান অঞ্চলগুলির পক্ষে সত্য। সেইজন্য মুসলমান সমাজের যে সাধারণ মনোভাব তাহা বঞ্চনার বেদনাসঞ্জাত। সেই মনোভাব সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়াছে এবং আনুসঙ্গিক অর্থনীতিক কারণের [যাহার কথা পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে] সহিত যুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, অর্থ, সম্পদ, জমিদারি ও উচ্চপদ প্রভৃতির অধিকারী ছিলেন তাঁহারা এই মনোভাবকে কাজে লাগাইয়া নিজেদের আরও সুবিধা করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

অন্যান্য কারণের প্রভাব—

হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা

হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলিলে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই তাহাতে আপত্তি করিবেন। কেননা তাঁহারা বরাবর জাতীয়তার কথা বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, নিজেদের জন্য কোনপ্রকার বিশেষ অধিকার দাবী করেন নাই, হিন্দুদের অনেক ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াও সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহিয়াছেন, নিজেদের জন্য কোন রক্ষাকবচ চাহেন নাই—এমন কি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাহার কার্য্য-কলাপও আত্মরক্ষা-মূলক ও জাতীয়তার অনুগামী। আপাত দৃষ্টিতে এই সকল উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধ্বনি ও কথাবার্ত্তার আড়ালে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা শক্তি সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হইতেছে। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বুঝিতে ইহার গঠনটাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অর্থনীতিক বিভাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতেই বলা হইয়াছে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট ও বড় ধনীর সংখ্যা হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক কম [যদিও খুব বড় নাম-করা ধনী ২।৪ জন আছেন]। ধনীর সংখ্যায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পার্থক্য না থাকিলেও খুব বেশী কিছু আসিয়া যাইত না। কারণ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ধনীর সংখ্যা খুব বেশী কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকিতে পারে না। ধনী ও কৃষকদের অন্তর্ব্বর্ত্তী যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের সংখ্যাও তুলনায় অনেক বেশী; জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের সংযোগও অপেক্ষাকৃত অধিক, আর তাঁহারা জনসাধারণকে প্রভাবিতও করিতে পারেন অনেক বেশী। আমাদের দেশে এখন শ্রমশিল্পের প্রসার না হওয়ায় প্রকৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু, তাহা হইলেও চাকুরিজীবী সম্প্রদায়, ছোট ও মাঝারি ব্যবসাদার, দোকানদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি লইয়া একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইঁহাদের বেশীর ভাগই বুদ্ধজীবী। চাকুরি ও ঐ ধরণের সুবিধার লোভে এবং বেকার সমস্যার চাপে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধাণতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিতান্ত সম্প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহাদের বাদ দিলে মুসলমানদের মধ্যে এই মধ্যবিত্তেরা নাই বলিলেই হয়। একদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই হিন্দু মধ্যবিত্ত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন এবং ইঁহাদিগকেই হিন্দুর স্বার্থ, হিন্দুর মর্য্যাদা, হিন্দুর সংস্কৃতি সভ্যতা ও হিন্দু মনীষার প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরণের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্ত্তী

কোন উপশ্রেণী না থাকায়, স্বল্প-সংখ্যক ধনী সমগ্র সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। অসংখ্য দরিদ্রই প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় হইয়াছেন।

এইভাবে যে-মধ্যবিত্তেরা হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা শোষণ-ব্যবস্থার অংশ হিসাবেই কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা জমিদারের, রাজা-মহারাজাদের, বড় বড় ধনীর এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের দালাল হিসাবেই কাজ করিয়াছেন; এই সব স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে ও তদনুযায়ী চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য দরিদ্র আছেন এবং ধনী ও স্বচ্ছল অবস্থার লোকের চেয়ে তাঁহাদের সংখ্যাই বহুগুণে বেশী। এমন কি যে-মধ্যবর্ত্তীরা সাম্রাজ্যিক ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেছেন এবং সেই স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলিয়া ভাবিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যেও স্বচ্ছল অবস্থার লোকের চেয়ে দরিদ্রের সংখ্যা, বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। তবুও তাঁহারা কায়েমী স্বার্থের পক্ষেই কাজ করিয়াছেন এবং এই স্বার্থকেই হিন্দুদের স্বার্থ বলিয়া সাধারণ লোকে গ্রহণ করিয়াছে; যদিও সাধারণের দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থা মুসলমানদের অপেক্ষা উন্নত নহে। কারণ, একটি সম্প্রদায়ে যদি শোষিত ও দরিদ্রের সংখ্যা শতকরা ৯৮জন হয় এবং অপর সম্প্রদায়ে ইহাদের সংখ্যা শতকরা ৯০জন হয় তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের আসল অবস্থার পার্থক্য বেশী-কিছু থাকে না। কিন্তু, শক্তিশালী মধ্যবিত্তদের সহায়তায় কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে কায়েমী

স্বার্থকেই হিন্দু স্বার্থের নামে চালাইতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন। জলের উপর শ্যাওলার ন্যায় বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের অগণিত দরিদ্র, অজ্ঞ ও বঞ্চিত জনসাধারণের মাথার উপর ইঁহারা ভাসিতেছিলেন। হিন্দু বলিতে লোকে ইঁহাদিগকেই বুঝিতেছিল; হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার বলিতে ইঁহাদেরই চালচলন ও সামাজিক চিত্র সকলের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতার আওতায় ইঁহাদের মধ্যে যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছিল, যে শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছিল, সৃজনী-প্রতিভা বিকাশের যে স্বল্প সুযোগ হইয়াছিল, তাহাই হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষা প্রভৃতি হিন্দু বৈশিষ্ট্যের নাম লইয়া চলিতেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য দরিদ্র ও অজ্ঞ লোক ইহাকেই হিন্দুদের গৌরব ও শ্লাঘার বস্তু এবং হিন্দুদের যোগ্যতার প্রমাণ ও মাপকাঠি বলিয়া ধরিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

সম্ভবতঃ ইহার পরে আরও এক ধাপ ইঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন। অনেক দিনের আত্মাবমাননা এবং পুঞ্জীভূত গ্লানির মধ্যে ইঁহারা যে সকল গৌরবের বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন ও বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহার উপর ইঁহাদের দরদ ও মমতা থাকা স্বাভাবিক। এই মমতার বশে ইঁহারা মনে করিয়াছেন, এইসব জাতীয় গৌরবের বস্তু সৃষ্টি করিবার অধিকার এবং তাহা রক্ষা করিবার দায়িত্ব ও যোগ্যতা একমাত্র তাঁহাদেরই আছে। অন্য কাহারও সেই অধিকার ও যোগ্যতা নাই। অন্যেরা যখন এইসব ব্যাপারে সমান অধিকার ও মর্য্যাদা চাহিতেছেন তখন তাহাকে সংস্কৃতির উপর আক্রমণ, বিশ্বজনীন গৌরবের জিনিষের উপর আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করা এবং লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা সহজ হইয়া গিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতে

উদ্ভূত ভারতের আধুনিক মিশ্র সভ্যতাকে লোকে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলিয়া মনে করিতেছে; এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়কে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপদ বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বাংলার ন্যায় মুসলমান-প্রধান প্রদেশে এইভাব, হিন্দুদের মধ্যে খুব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্তেরা সাম্প্রদায়িক বুলির সাহায্যে উন্নত হইবার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন; নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণের কাছে তাঁহারা উগ্র-সাম্প্রদায়িকতার কথা বলিয়া সেই পথেই তাহাদিগকে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন; এই সকল কারণে হিন্দুদের মধ্যে ঐ আশঙ্কা বিস্তারলাভের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে পাওয়া যাইত না—সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতির দোহাই দিয়া সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁহাদিগকে সহজেই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতেছেন।

হিন্দু মধ্যবিত্তদের এক বিপুল অংশের মধ্যে জাতীয় মুক্তি-কামনা জাগিয়াছিল; এবং সেজন্য তাঁহারা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুবিধা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্থূল সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে ইঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে টানিয়া আনা সম্ভব হইত না। ইঁহাদের মধ্যে একদিন যে মুক্তি-কামনা জাগিয়াছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত সব জিনিষকে অবলম্বন করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইসব জিনিষকে ইঁহারা জাতীয়তার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং এই সকল জিনিষকে বাদ দিয়া ইঁহাদের কাছে জাতীয়তার আর কোন অর্থ ছিল না। কাজেই যখন ইঁহাদের মনে এই ধারণা জাগিল যে, মুসলমানেরা এই সকল জিনিষই আক্রমণ করিতে চাহিতেছেন, তখন জাতীয় মুক্তি অপেক্ষা এই সকল জিনিষকে রক্ষা করাই ইঁহারা জাতীয় জীবনের পক্ষে

অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কথার প্রত্যুত্তরে [যদিও প্রত্যুত্তর দানের জন্য নহে] মুসলমানেরাও নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতির কথা বলিতেছেন এবং তাহাতে এইসব হিন্দুদের শঙ্কা আরও দৃঢ় হইতেছে। একদিকে যেমন শোষিত জনসাধারণের স্বার্থকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলিয়া চালানো হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা অল্প কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইতেছেন, তেমনই অন্যদিকে মুষ্টিমেয় লোকের যে কায়েমী স্বার্থ তাহাকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের নামে চালাইয়া মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু, স্বার্থের সংঘাতটা কোথায় কীভাবে প্রথমে আরম্ভ হইল এবং কেনই-বা হিন্দুদের মধ্যে একদল লোক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে দানা বাঁধাইবার কাজে লাগিয়া গেলেন ও নানা কৌশল ও বুলির সাহায্যে বহু লোককে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে টানিয়া আনিতেছেন ? হিন্দুরা বলিবেন, তাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িকতা চাহেন নাই—সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য, জাতীয়তাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সাম্প্রদায়িক হইতে বাধ্য হইতেছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলিবেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু, আসলে সাম্প্রদায়িক ধুয়া না তুলিয়াও সুখ-সুবিধার একচেটিয়া অধিকার তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন ; এবং সেই কারণেই তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রণী হওয়ার ফলে শাসনতন্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা, সুবিধা ও মর্য্যাদার স্থানগুলি তাঁহারা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন ; এবং ইহারই পরোক্ষ সহায়তায় পরাধীন দেশে সুবিধা ও অর্থার্জ্জনের অন্য যে সকল ক্ষেত্র আছে সেখানেও

আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, সেখান হইতে তাঁহাদের অপসারিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনুকূল অবস্থার মধ্যে যোগ্যতা অর্জ্জনও ইঁহাদের পক্ষে অনেক সহজ ছিল। কাজেই, যোগ্যতার কথা বলিয়া, ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়া ইঁহারা যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, একথা মনে করিবার কারণ নাই। যাঁহাতে অবস্থান্তর না ঘটে, যে সকল সুবিধা তাঁহারা অনেক দিন ধরিয়া ভোগ করিতেছেন তাহা যাহাতে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকে তাহাই তাঁহারা চাহিয়াছেন। এই অধিকার রক্ষার পক্ষে উদার অসাম্প্রদায়িক কথাই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়াছে। ভূসম্পত্তিগত ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এই ব্যবস্থাতেও সুবিধাজনক স্থানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা হিন্দু, তাঁহারাও চলিত ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন। এজন্যও সাম্প্রদায়িক কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই এবং অসাম্প্রদায়িক কথাবার্ত্তাই তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অধিকতর সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু, যে মুহূর্ত্তে অন্যেরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে তখনই ইঁহাদের মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে চালাইবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। এখন হইতেই দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় তাহা সাম্প্রদায়িক বিরোধের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

সুখ-সুবিধার একচেটিয়া অধিকার একদল হিন্দুর হাতে দীর্ঘকাল ছিল বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, এই সকলের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই আছে, যেখানে অন্যদের প্রবেশ অনেকটা অনধিকার প্রবেশ এবং তাহা একজনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টার তুল্য অন্যায় ও অসঙ্গত।

ইহাতে একদিকে তাঁহারা স্বার্থহানির পীড়া অনুভব করিয়াছেন এবং অন্যেরা তাঁহাদের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে—এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থহানি হইতেছে, একথা বলা অশোভন এবং তাহাতে স্বার্থরক্ষা করিবার মত শক্তি সঞ্চয়ও করা যায় না। বৃহত্তর স্বার্থের লেবেল আঁটিয়া দিতে পারিলেই তবে সব দিক দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে তাঁহারা সুবিধাও পাইয়া গেলেন। আমাদের শাসকেরা দেখিলেন, দেশের যে-রাজনীতিক অসন্তোষ জাতীয় মুক্তি-চেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহার নেতৃত্ব করিতেছেন। ইঁহাদের সকলকে চাকুরি বা সুবিধা দিয়া বশীভূত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা নূতন সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলেন। অর্থনীতিক অসন্তোষপুষ্ট সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে তাঁহারা হাতের কাছে পাইয়া গেলেন এবং তাহাকেই সুকৌশলে কাজে লাগাইলেন। চাকুরি ও শাসন-সংক্রান্ত সুবিধা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টন করিয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়িক লোভকে তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিলেন এবং সুবিধা দানের বিনিময়ে ইহাকে জাগাইয়া রাখিবার লোকও পাইয়া গেলেন।

এই নবলব্ধ সুবিধাকে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিবার মানুষও জুটিয়া গেল। সম্প্রতি ইংরাজী শিক্ষা সব স্তরের লোকের মধ্যেই প্রবেশ করিতেছিল এবং এই নূতন শিক্ষিতদের চাকুরি পাইবার লোভও খুব বেশী ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক উপায়ে তাঁহাদের তাহা পাইবার উপায় ছিল না। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহাদের সেখান হইতে হঠায় কে ? কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অধিকার পাইয়া ইঁহারা খুব

সুবিধা পাইয়া গেলেন ; যাহাতে এই সুবিধা বজায় থাকে এবং তাহার পরিসর বাড়িয়া যায় তাহার জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধ্বনিই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইল। নূতন সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে যাঁহাদের স্বার্থহানি ঘটিতেছিল, তাঁহারাও ইহাতে সুবিধা পাইয়া গেলেন। ইঁহাদের স্বার্থকে এতদিন সকলেই ইঁহাদের প্রাপ্য স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল ও ইঁহাদের স্বার্থকে হিন্দুসমাজের স্বার্থ বলিয়া ভাবিতেও অভ্যস্ত হইয়াছিল। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক ধ্বনির অন্তরালে যখন অন্যেরা এতদিনের একচেটিয়া সুবিধার ভাগ চাহিলেন তখন তাহাকে হিন্দুস্বার্থের উপর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণ বলিয়া প্রচার করা এবং অন্যকে তাহাই বিশ্বাস করান ইঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছেও তাঁহারা বলিতে পারিলেন: আসলে ইহা জাতীয়তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযান। হিন্দুস্বার্থের দিক দিয়াই হউক অথবা জাতীয় অখণ্ডতার দিক দিয়াই হউক ইহার প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক। কিন্তু কীভাবে ইহার প্রতিরোধ করা যাইবে ? সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে; মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা জনসাধারণের নামে যেসব সাম্প্রদায়িক দাবী করিতেছেন, হিন্দুনেতাদেরও হিন্দু সম্প্রদায়ের নামে তাহার পাল্টা দাবী করিতে হইবে। অর্থাৎ জাতীয়তার কথা, যোগ্যতার কথা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন করিবার দাবী—যাহাই কিছু বলা হউক না কেন, সমস্ত কথার পশ্চাতে এই কথাটা থাকিয়া গেল যে, হিন্দুদের জন্য চাকুরির ভাগ, সুবিধার ভাগ, শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার ভাগ আরও বেশী চাই এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বর্ত্তমানের সুবিধাভোগীরাই তাহা ভোগ করিবেন। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, সমস্ত উদার কথার

পশ্চাতে, জনসাধারণের নাম ভাঙ্গাইয়া, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দোহাই দিয়া, স্বার্থান্বেষীদের স্বীয় স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই কাজ করিতেছে। সাম্প্রদায়িক কথা না বলিয়া, অ-সাম্প্রদায়িক যুক্তি দেখাইয়া যদি সুবিধা ভোগ করা যায় তবে সহসা সাম্প্রদায়িক কথা লোকে বলিতে যাইবে কেন? যখনই সে সুবিধায় বিঘ্ন ঘটিয়াছে তখনই সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিতে হইয়াছে।

সমাজের নিম্নস্তরে ভয়াবহ দারিদ্র্যের জন্য যেখানে যে-জাগরণ দেখা দিয়াছে তাহাকে যেমন একদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, অন্যদিকে তেমনই সর্ব্বপ্রকার অর্থনীতিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে, হিন্দু স্বার্থ-বিরোধী আন্দোলন বলা হইতেছে—বিরাট কৃষক আন্দোলনকে হিন্দু স্বার্থ-বিরোধী চেষ্টা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। কোন কোন স্থানে হিন্দু-জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলমান-কৃষকের অসন্তোষকে, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের অভ্যুত্থান বলিয়া অর্থনীতিক বিরোধকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের রূপ দেওয়া হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনীতিক সংস্কার-প্রচেষ্টাকেও হিন্দুর স্বার্থ-বিরোধী চেষ্টা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে। এইভাবে সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থকে—সাম্রাজ্যিক স্বার্থের দালালির সুবিধাকে হিন্দু স্বার্থ বলিয়া দাঁড় করান হইতেছে।

যাঁহারা অকপটে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, আজ তাঁহাদের আত্ম-পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। যে-স্বার্থকে হিন্দু স্বার্থ বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে তাহা হিন্দু সমাজের কয়জনের স্বার্থ? লোকে এতদিন কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে হিন্দুদের প্রতিনিধি মনে করিয়া আসিয়াছে। আমরা ভাবিয়াছি, জমিদার, গাঁতিদার, মহাজন, বড় বড় ব্যবসায়ী, ধনী এবং বড় বড় সরকারী চাকুরিয়া

প্রভৃতি লোকেরাই হিন্দুদের গৌরব—হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ। ইঁহারা রক্ষা পাইলে—ইঁহাদের উন্নতি হইলেই সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষা ও উন্নতি। অথচ কিন্তু, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষের কথা কেহ মনে করে নাই। মনে করে নাই যে, তাঁহারাই হিন্দু সমাজের শতকরা ৯০জন—তাঁহারা বাঁচিলে, তাঁহাদের স্বার্থলাভ হইলে তবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণ।

হিন্দু সম্প্রদায়ের এই অগণিত জনগণের স্বার্থ কী? দেশে প্রচলিত জমিদারী-স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ এক নহে; বরং তাঁহাদের স্বার্থ ইহার বিপরীত দিকেই অবস্থিত। জমিদারী এবং মহাজনী ব্যবস্থার দ্বারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের ন্যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরাও শোষিত হইয়া আসিয়াছেন; এই দিক দিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাঁহাদের সমশ্রেণীর মানুষের সহিতই তাঁহাদের স্বার্থের ঐক্য রহিয়াছে। আজ-যে গাঁতিদার-জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিতে চাহিতেছেন, তাহা হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যও নহে—হিন্দু-জনগণের কল্যাণের জন্যও নহে; তাহা সম্পূর্ণ আত্ম-কল্যাণের জন্য। আজ-যে দেশে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই আন্দোলনকে যদি তাঁহারা সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে পারেন তবেই তাঁহারা কিছুকালের জন্য রক্ষা পাইবার আশা করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে পারিলে, তাঁহারা আরও অনেক লোকের সমর্থন পাইবেন। এমন কি, এইসব আন্দোলনে যাঁহাদের লাভ হইবে সেই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীরও বহুজনের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবেন; কৃষক ও শ্রমিকদের দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিতে

পারিবেন। আরও পারিবেন, উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ ও হাঙ্গামা বাধাইয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে। এই কার্য্যের দ্বারা ইঁহারা সাম্রাজ্যিক নীতিকে সফল করিয়া তুলিতেছেন এবং সামন্ততন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিয়া আমাদের শাসকেরা যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহারই সার্থকতা প্রমাণ করিতেছেন।

যাঁহারা চাকুরিজীবী এবং বেশী চাকুরি চাই বলিয়া কোলাহল করিতেছেন—তাঁহাদের সহিতও জনসাধারণের স্বার্থের কোন সংস্রব নাই—আত্ম-স্বার্থের জন্যই তাঁহারা তাহা করিতেছেন। সাম্রাজ্যিক নীতি জনসাধারণের শোষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই নীতির যাঁহারা প্রধান বাহক তাঁহারা-যে একই সঙ্গে জনস্বার্থের বাহক হইতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুবিধান্বেষীদের মধ্যে সুবিধার ভাগ লইয়া যে-দ্বন্দ্ব, তাহা-যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এই ধারণা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুদের পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। এখানে সব সম্প্রদায়েরই সুবিধা-লোভীদের স্থান ও কার্য্য একই। তাঁহারা কেহই কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নাম ভাঙ্গাইতেছেন মাত্র। ইঁহাদের কোলাহলেই আসর গরম রহিয়াছে; সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে ইঁহারাই দায়ী সবচেয়ে বেশী। ইঁহাদের একদল যখন সম্প্রদায়ের নাম করিয়া নিজেদের জন্য দাবী পেশ করেন, তখন স্বভাবতই এই ধারণা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তারলাভ করে যে, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই তাঁহারা কথা বলিতেছেন। আবার অন্য পক্ষেরা যখন পাল্টা দাবী পেশ করেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা বিস্তারলাভ করে। এইসব দাবী ও পাল্টা দাবীর

মধ্যে যেসব অসঙ্গত কথা ও প্রস্তাব থাকে, তাহার সহিত সম্প্রদায়ের সমস্ত সাধারণ লোকেরও সংযোগ আছে, এই সন্দেহ প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে পোষণ করেন। এইভাবে এক সম্প্রদায়ের সাধারণ লোক অন্য সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষের দাবী ও প্রস্তাবের সঙ্গতি-অসঙ্গতি লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের সংবাদ-পত্রে, সভা-সমিতিতে, ক্লাবে, সাধারণ স্থানে, ব্যক্তিগত তর্ক-বিতর্কে সর্ব্বত্র আলোচনা ও বিরোধের ভাব চলিতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িকতা খুব শক্তভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে। এইভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যখন জমাট বাঁধিয়া উঠে, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই পারস্পরিক বিদ্বেষ যখন কানায় কানায় ভর্ত্তি হইয়া উঠে তখন দেশের সর্ব্বত্র ছোট বড় আরও এমন নানা কারণ ঘটিতে থাকে যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা নূতন ইন্ধন, নূতন খোরাক পায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আওতায়, সাম্রাজ্যিক নীতির সুকৌশল সূক্ষ্ম পরিচালনায়, সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষীদের সমবেত চেষ্টায়, এই বিদ্বেষ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে এবং সামান্য স্ফুলিঙ্গ সংযোগে বিরাট দাবানলের ন্যায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

এইভাবে যখন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি তীব্র আকার গ্রহণ করে, বিবিধ কদর্য্যতা ও আত্মঘাতী বাতুলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তখন ইহা নিজের জোরেই নিজে অগ্রসর হইয়া চলে, প্রতিবাদে শক্তিসঞ্চয় করে এবং চারিদিক হইতে নূতন ইন্ধন সংগ্রহ করে। মুখে যিনিই ইহার যে নিন্দা করুন, উভয় সম্প্রদায়ের সুবিধান্বেষীদের ইহাতে সুবিধাই হয়, সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও তাহার অনুচর কায়েমী স্বার্থ ইহাতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে; আর সর্ব্বনাশ হয় উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ জনসাধারণের। হিন্দুদের

মধ্যে যাঁহারা অ-সাম্প্রদায়িক ধ্বনির অন্তরালে সাম্প্রদায়িকতার পতাকা বহন করিতেছেন, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের দায়িত্ব তাঁহাদের অন্যদের অপেক্ষা কম নহে; এবং হিন্দু-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের স্বার্থের প্রতিনিধিও তাঁহারা নহেন। মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অর্থনীতিক অসন্তোষকে মূলধন করিয়া যেমন জনসাধারণকে ভুলাইয়া সাম্প্রদায়িকতার পথে আনিতেছেন—হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারাও তেমনই এই অর্থনীতির বিপরীত দিকে অবস্থিত কায়েমী স্বার্থকে হিন্দু স্বার্থ বলিয়া চালাইয়া হিন্দুদিগকে সংঘবদ্ধ করিতেছেন। উভয় পক্ষেই অর্থনীতিক কারণ সংযুক্ত হওয়ায় বিরোধ তীব্র ও সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু, হিন্দুদের একটি সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা, আভ্যন্তরীণ উপ-সাম্প্রদায়িক চেষ্টার জন্য অনেকটা প্রতিহত হইয়াছে। হিন্দুরা অসংখ্য উপ-সম্প্রদায়ে অর্থাৎ জাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি জাতিরই কিছু স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে; আর নানাবিধ নিষেধের গণ্ডী সেই স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের যে-আহ্বান তাহা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছেই অল্প-বিস্তর পৌঁছিয়াছে; এবং তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িকভাবে কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধও করিয়াছে। আভ্যন্তরীণ বিভাগের গণ্ডীগুলি তুলিয়া দিবার আন্দোলনের দ্বারা হিন্দুদের একটি সংহত সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার চেষ্টাকে অগ্রসর করা হইয়াছে। তাহা হইলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এখনও রহিয়া গিয়াছে এবং আর্থিক অসন্তোষ মিশিয়া সেই স্বাতন্ত্র্যবোধকে কিছুটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের স্বার্থ-যে সমাজের

উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র—এইবোধ জাগ্রত করিতে মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারাও অল্প-স্বল্প সাহায্য করিয়াছেন; এবং উপ-সাম্প্রদায়িক নেতারা-যে ইহার দ্বারা লাভবান হইতে পারেন—সে দৃষ্টান্তও তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তাঁহারা-যে কীভাবে এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুদের মধ্যে সক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা প্রধানত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এবং ইহা ক্রমেই তাঁহাদিগকে অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ইঁহাদের চেষ্টায় ক্রমে সমাজের সর্ব্বস্তরে ইহা প্রবেশলাভ করিতেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য যখন দেশের আবহাওয়া অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন সর্ব্বস্তরের লোকই ক্রম-বর্দ্ধিত সংখ্যায় সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্তেরাই-যে ইহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চাকুরিজীবী, তাঁহারা তো আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনে সত্য-মিথ্যা যাহাই হউক, নির্ব্বিচারে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিবেনই। যাঁহারা ইহার সহায়তায় ক্ষমতা ও মর্য্যাদার আসনলাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের পক্ষেও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, নানা কারণে হিন্দু মধ্যবিত্তদের সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। চাকরি-বাকরি অথবা জমিদারী-ব্যবস্থার দ্বারা ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় আর নাই। অর্থাভাব ও কর্ম্মাভাব আজ ইঁহাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তবুও, ইঁহাদের মন হইতে এই ক্ষীণ আশা যায় নাই যে, চাকরি-বাকরির দ্বারাই ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত জীবিকা নির্ব্বাহ ও সাংসারিক উন্নতি করিতে পারিবেন। ইঁহাদের মনের এই দুর্ব্বলতাকেই চাকুরিজীবী ও পদলোভীরা ভাঙ্গাইয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন।

ইঁহারা চাকুরীর প্রত্যাশী বলিয়া ইঁহাদের পক্ষে এই কথা বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে, অন্যান্যেরা এবং বিশেষ করিয়া মুসলমানেরা যদি এখানে প্রবেশ না করিতেন তাহা হইলে ইঁহারা বর্ত্তমান দুরবস্থায় পতিত হইতেন না। ইঁহাদের এই ধারণাতেই আসলে ভুল রহিয়া গিয়াছে; দেশের বর্ত্তমান যে-অর্থনীতিক কাঠামো—তাহার মধ্যেই মধ্যবিত্তদের আর স্থান নাই। সামন্ত-প্রথার লোপ হইয়া শিল্পের বিকাশ ঘটিলেই তবে তাঁহাদের দুরবস্থার আংশিক ও সাময়িক প্রতিকার হইবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার পূর্ণ প্রতিকার সম্ভব হইবে। কিন্তু, সামন্ততন্ত্রের অবসানের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাই সবচেয়ে বড় বাধা; আর সেই বাধাকে শক্তিশালী করিয়া তাঁহারা নিজেদের বাঁচিবার পথকেই অবরুদ্ধ করিতেছেন চাকরি-বাকরিতে-যে সুবিধা হইবার আশা নাই তাহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহাদের হাতের কাছেই আছে। যখনই কোন একটি সাধারণ চাকুরি খালি হয়, তখনই তাহার জন্য সংখ্যাতীত প্রার্থী উমেদার হইয়া পড়েন। একটি তিরিশ টাকা বেতনের চাকুরি খালি হইলে তাহার জন্য দুই-এক শত গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের দরখাস্ত করা সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। দরখাস্তকারীদের অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত সবই প্রায় হইবেন তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। পদের তুলনায় এই প্রার্থীদের সংখ্যা-যে কত বেশী, ইহার দ্বারাই তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। যদি সব চাকুরির জন্যও পূর্ব্বের ন্যায় মাত্র ইঁহাদের মধ্য হইতেই লোক সংগৃহীত হইত, তাহা হইলেও নিতান্ত অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিই নিযুক্ত হইতে পারিতেন এবং যে-সমস্যা সেই সমস্যাই থাকিয়া যাইত কাজেই হিন্দু মধ্যবিত্তেরা-যে তাঁহাদের দুরবস্থার জন্য মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে মনে মনে দায়ী করিতেছেন, তাহার মূলে কোন সত্য নাই

তবে যাঁহারা কার্য্যত চাকুরি বা সুবিধাভোগ করিতেছেন এবং নিজের কোন আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিশেষ একটি পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের হাত হইতে এরূপ দুই-একটি পদ ফস্‌কাইয়া যাইতেছে। এবং তাঁহারা সেই সব দৃষ্টান্তগুলিকে মূলধন করিয়া হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক অবিচারের কথা প্রচার করিতেছেন। কিন্তু, আসলে ইহা দুই-চারিজন লোকের স্বার্থের ব্যাপার মাত্র—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যার ব্যাপক প্রশ্নের সহিত ইহার কোন প্রকার সংস্রব নাই। তাহার পর এ-প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। চাকুরির যে সকল ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করা হইতেছে সমগ্র চাকুরির তুলনায় তাহার অনুপাত খুব বেশী নহে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—মুসলমানেরাও চাকুরির ক্ষেত্রে আসুন, তাহাতে আপত্তি নাই—আপত্তি হইতেছে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসিতে চাহিতেছেন বলিয়া। কিন্তু এখানেও একটা বিষয় দেখা দরকার। যোগ্যতা প্রভৃতি যেসব কথা বলা হইতেছে তাহা অনেকটা অর্থহীন; কারণ কোন নূতন প্রতিযোগীর পক্ষে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে যাওয়া সহজ নহে। অথচ, এখানে আজও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গে নাই; সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির ভিত্তি রহিয়া গিয়াছে ও তাহা নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এ-অবস্থায় মুসলমান জনসাধারণের মনে এই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক যে, সব ব্যাপারেই তাঁহাদের উপযুক্ত অংশ থাকুক, হাত থাকুক, দায়িত্ব থাকুক! সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁহাদের এই বুদ্ধিকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাস্তব অবস্থার কথা ভুলিয়া হিন্দুরা যদি শুধু জাতীয়তার দোহাই দেন, তাহা হইলে মুসলমানদের মনে এই সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, মুসলমানদের দূরে সরাইয়া রাখিবার ইহা একটা

অছিলা মাত্র। নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের হাত ও অংশ থাকিবে ইহাতে অন্যদের সহিত প্রতিযোগিতামূলক যোগ্যতার কথা উঠে না, ইহা ন্যূনতম যোগ্যতার কথা। সাম্প্রদায়িক অভিযানে বাধা দিবার জন্য যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধতা করিতেছেন, আসলে তাঁহারা দুই পক্ষের সাম্প্রদায়িকতাকেই বাড়াইয়া দিতেছেন। ইহাদের এই বাধাদানের কথাকে জনসাধারণের কাছে ফলাও করিয়া বলিয়া, মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁহাদের নেতৃত্বকে দৃঢ় করিতে পারেন; আবার হিন্দুদের উপর তাহার যে প্রতিক্রিয়া হয়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা তাহাতে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিবার অধিকতর সুবিধা পান। অথচ, যে-হিন্দু মধ্যবিত্তেরা উদার ও প্রগতিশীল বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা যদি কোন প্রকারে সাম্প্রদায়িক অংশ অভিনয় না করিতেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতা এতটা দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিত না।

সাম্প্রদায়িক নেতারা যে, সাম্প্রদায়িক উক্তি করিতেছেন, নানাবিধ অসঙ্গত দাবী করিতেছেন তাহার জন্য সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে নাই। যদি তাঁহারা জনসাধারণকে দলে টানিতে না পারিতেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে বিষহীন সর্পের গর্জ্জনের ন্যায় তাঁহাদের সকল তর্জ্জন গর্জ্জন নিষ্ফল হইয়া যাইত। তাঁহারা জনসাধারণকে ভুল পথে চালাইয়া নিজেদের পিছনে টানিতে পারিতেছেন বলিয়াই আজ তাঁহাদের এত দাপট। কাজেই, যাঁহারা সত্য সত্য সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহেন, সাম্প্রদায়িক নেতাদের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের দৃষ্টি জনসাধারণের দিকেই নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কোন্ কাজে তাঁহাদের মনের উপর কি ফল হইবে, কোন্ নীতি ও কথায় কি প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে তাহাই বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িক বিভাগের সাহায্যে মুসলমানদের মধ্যে যে নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে সেই নূতন সম্প্রদায়ই আবার সাম্প্রদায়িক অভিযানের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইবে। আজ মুসলমানদের মধ্যে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় না থাকায়, অর্থনীতিক বঞ্চনার অনুভূতি সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করিতেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবার পরও যখন মুসলিম জনসাধারণের দুঃখ দূর হইবে না—দুঃখের আসল কারণ তখন লোকের কাছে স্পষ্ট হইয়া ধরা দিবে। সাম্প্রদায়িক নেতাদের নেতৃত্বে জনসাধারণ আর পরিচালিত হইবেন না। তারপর যাঁহারা ব্যক্তিগত লোভকে সম্মুখে রাখিয়া সুবিধা লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক বুলি আওড়াইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শীঘ্রই আত্ম-কলহ দেখা দিবে ও নানা দল-উপদলের সৃষ্টি হইবে। কেন না, চাকুরি ও লোভনীয় পদের সংখ্যা প্রার্থীদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। অথচ, যাঁহারা সাম্প্রদায়িক দলে ভিড়িয়াছেন তাঁহাদের সকলেই সুবিধান্বেষী। ইহার লক্ষণ এখনই দেখা যাইতেছে আর ইহাই সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। আজ যে বাংলাদেশে বাঙ্গালী মুসলমান বনাম অবাঙ্গালী মুসলমানের প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহাও উক্ত পরিণতিরই ইঙ্গিত করিতেছে। কারণ যাঁহারা প্রত্যাশিত সুবিধা লাভ করিতে পারেন নাই এবং যাঁহাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া অন্য লোকে তাহা ভোগ করিতেছে তাঁহারা এই নূতন বুলির সাহায্যে সেই সকল সুবিধা লাভের চেষ্টা করিতেছেন। নহিলে, সারা ভারতের মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থের জন্য মুসলিম নেতাদের যে-দরদ, বাঙ্গালী মুসলমান সাধারণের জন্য বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের দরদের, তদপেক্ষা অন্যতর কোন কারণ নাই। তাহা হইলেও ইহাতে লোকের কাছে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কাজেই, হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা অপকটে সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহেন এমন অনেক লোকও, অ-সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা-মূলক ব্যবস্থা, গুণ ও যোগ্যতার সমাদর প্রভৃতি আপাত যুক্তি-যুক্ত কথায় ভুলিতেছেন। তাঁহারা আসলে ক্ষুব্ধ সুবিধাভোগীদের ভ্রান্ত যুক্তি-জালে ধরা দিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক চক্রান্তকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছেন। সাম্প্রদায়িকতা কমাইবার জন্য তাঁহারা যে-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করিতেছে মাত্র। সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্য ইঁহারা যাহাদের দায়ী করিতেছেন, তাহাদের সহিত সমানভাবে নিজেরাও একই দোষে দুষ্ট হইতেছেন। ইঁহারা যেমন কতকগুলি আপাত-সঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া লইয়াছেন, অপর পক্ষের মুখেও তেমনই কতকগুলি আপাত-সঙ্গত যুক্তি আছে। ইঁহারা যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের শহীদ মনে করিতেছেন, অপর পক্ষের মনেও ঠিক অনুরূপ ভাব রহিয়াছে।

হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে একদল লোক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার একটা দৃষ্টান্ত সচরাচর দিয়া থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা উদার জাতীয়-নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন, যে-কোনও প্রকারের সাম্প্রদায়িকতাকে নিন্দা করিয়া থাকেন, সকল সম্প্রদায়ের প্রীতি ও ঐক্যকে সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণের পক্ষেই অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করেন, মুসলমানেরা তাঁহাদের দূরে সরাইয়া দিয়াছেন, মুসলিম স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছেন এবং মুসলমান জনসাধারণের উপর ইঁহাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু, হিন্দুরা কী করিতেছেন? যতক্ষণ অ-সাম্প্রদায়িক থাকিয়াও সুবিধা-সুযোগ সমূহের একচেটিয়া অধিকার তাঁহাদের হাতে ছিল ততক্ষণ অবশ্য তাঁহারা জাতীয়তার কথা বলিয়াছেন। জাতীয়তার

সমর্থকদের পূজা করিয়াছেন। কিন্তু যখনই তাঁহাদের সুবিধার অধিকার ভোগে বাধা ঘটিল তখনই তাঁহারা চাহিলেন, মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের অনুসৃত নীতির উত্তরে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারাও পাল্টা সাম্প্রদায়িকতা করুন। জাতীয় নেতাদের অনেকেই অবশ্য তাহাই করিতেছেন, কেহ-বা প্রকাশ্যে হিন্দু সভার পতাকাতলে, কেহ কেহ-বা জাতীয়তার মুখোসের অন্তরাল হইতে। কিন্তু আসলে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার উত্তরে পাল্টা সাম্প্রদায়িকতা করিতে চাহিলেন না, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থের ঐক্যকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিতে চাহিলেন, জাতীয়-মুক্তি প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাজ বলিলেন, তাঁহারাও হিন্দু সাধারণ [বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত] কর্তৃক হিন্দু স্বার্থ বিসর্জ্জনকারী, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কাছে অত্ম-সমর্পণকারী বলিয়া নিন্দিত হইতে লাগিলেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অ-সাম্প্রদায়িকতার নামে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার এতটা বেশী হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী ও প্রচেষ্টাকারী হিন্দুদের ইঁহারা কৃপার পাত্রই মনে করিতেছেন।

যাঁহারা স্বাধীনতা, জাতীয়মুক্তি প্রভৃতির কথা বলিতেছেন এবং তবুও প্রকৃত অ-সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার নিকট আত্ম-সমর্পন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তাঁহারা-যে সাম্রাজ্যিক নীতির কূট কৌশলে ধরা দিয়া, জাতীয় মুক্তির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সে কথাটাও তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। ভারতের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কী উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির পত্তন হইয়াছিল, কাহারা ইহা করিয়াছিলেন, কেনই-বা ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কাহাকেও কিছু বেশী বা কাহাকেও কিছু কম দেওয়া হইয়াছিল—সে সব কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার। ইহা লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীদের ও সুবিধা-

প্রত্যাশীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি, বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি চলিবে এবং তাহা বহু লোকের রাজনৈতিক চেতনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, অ-সাম্প্রদায়িক লোকদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপণ করিবে, ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। নিজেদের সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে যিনি যাহাই বলুন না কেন— সকলেই সেই নীতিকেই সার্থক করিয়া তুলিতেছেন।

নবম অধ্যায়

সরকারী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

বর্ত্তমানে সরকারী রাজনীতির প্রধান আশ্রয় হইতেছে সাম্প্রদায়িকতা। পশ্চাৎ হইতে উৎসাহ দিয়াও ইহাকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া তোলাই ইহার প্রধান কাজ। এজন্য এমন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যাহাতে সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ইহা দাবী করিবার লোক জুটিয়া যায়। ১৮৯২ সালে ভারতীয়-কাউন্সিল-আইনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবী সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। ১৯০৬ সালে মাননীয় আগাখাঁয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। লর্ড মিণ্টো ইঁহাদের বলেন, "আমিও আপনাদের ন্যায় বিশ্বাস করি যে, এই মহাদেশের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি কোন নির্ব্বাচন-প্রথা ব্যক্তিগত ভোটাধিকারকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে—তাহা হইলে তাহা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইবে।" তিনি তাঁহাদের বলিলেন, "কেবলমাত্র সংখ্যায় নহে, রাজনৈতিক গুরুত্বে এবং সাম্রাজ্য

সেবার পরিমাণ অনুসারেও আপনাদের সম্প্রদায় শাসনতান্ত্রিক সুবিধালাভ করিতে চাহে বলিয়া আপনারা যে-দাবী করিয়াছেন তাহাতে আমি আপনাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত।" স্বদেশী আন্দোলনে যখন ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের ও তাহার শক্তির পূর্ব্বাভাষ পাওয়া গেল এবং সাম্রাজ্যের কর্ণধারেরা বিপদের ইঙ্গিত পাইলেন, ঠিক তাহারই অব্যবহিত পরে এই ঘটনাটি বিশেষ ইঙ্গিত-পূর্ণ। যে প্রকার ব্যস্ততার সঙ্গে বড়লাট প্রতিনিধিদলের দাবী গ্রাহ্য করিলেন, তাহাতে ইহার পশ্চাতে-যে সরকারী ইঙ্গিত ছিল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি মৌলনা মহম্মদ আলি সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেন। তিনি বলেন, "ইহা যোগ-সাজসের ব্যাপার। মুসলিম প্রতিনিধি দলটি সরকার পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।" এই ১৯০৫ সালেই মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

এইভাবে যাহার গোড়াপত্তন হইল তাহার পরিণতি-যে কোন পথে হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র আকারে ইহার আরম্ভ হইল বটে কিন্তু, পরে ধাপে ধাপে ইহাকে সমগ্র শাসনতন্ত্রের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় লাটের শাসন পরিষদ হইতে গ্রাম্য পঞ্চায়েত সর্ব্বত্রই এই বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে এবং ইহার বেড়াজালে সমস্ত দেশ বেড় পড়িয়াছে। ১৯০৮ সালে লর্ড মর্লে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ১৯০৯ সালের আইনে মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু, সুবিধাদানের ব্যবস্থা ব্যাপক না হইলে, সুবিধাভোগকারী ও সুবিধালোভীদের সংখ্যা বাড়ে না এবং দেশের উপর প্রভাব বিস্তারের পথও প্রশস্ত হয় না। সুবিধাটা সম্প্রদায়ের নামে না দিলে, নিজেদের পশ্চাতে সমগ্র সম্প্রদায়কে টানিতে

পারা যায় না ; অথবা সমগ্র সম্প্রদায়কে সুবিধাদানের আশ্বাসে প্রলুব্ধ করিয়া জাতীয় ঐক্যের পথে বিঘ্ন স্বরূপ দাঁড় করানও যায় না। মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার অনুসারে মুসলমানেরা যেখানে তিন হাজার টাকার আয়ের উপর আয়কর দিলে ভোট দিতে পারিবার অধিকার পাইলেন, সেখানে তিন লক্ষ টাকার কম বার্ষিক আয়ের অ-মুসলমানেরা সে অধিকার পাইলেন না। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারে ভাগ আরও বাড়ান হইল। হিন্দুদের ভিতর অনুন্নতদের পৃথক একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল ; শিখ, দেশীয় খ্রীষ্টান, এংলো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সকলেই পৃথক সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা পাইলেন।

মুসলমানদের বাছিয়া বাছিয়া বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইল কেন ? হিন্দু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের নানা অসন্তোষ রাজনীতিক চেতনা ও চাঞ্চল্যের আকারে দেখা দিয়াছিল, কাজেই বিপদ-যে কোন দিক হইতে, কাহাদের নিকট হইতে আসিবে তাহা ধুরন্ধর সাম্রাজ্যিক রাজনীতিকেরা বুঝিয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ইঁহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, জনসাধারণকে ইঁহাদের চেষ্টার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ দাঁড় করানই হইল তাঁহাদের নীতি। আন্দোলনকারিগণ প্রধানত হিন্দু ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য ছিল বলিয়া সুযোগও সহজে পাওয়া গেল। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও বঞ্চনার ক্ষোভ ও সরকারী অনুগ্রহে উন্নতিলাভের মিথ্যা আশা ছিল। কাজেই, সব দিক দিয়া যোগাযোগ ঘটিয়া গেল।

হিন্দুদের রাগ কিন্তু, গিয়া পড়িল মুসলমানদের উপর। সমস্ত ব্যাপারের গোড়ায় সরকারী চেষ্টা যদিও কিছুমাত্র অস্পষ্ট ছিল না, তবুও জাতীয় আন্দোলনের পথে বিঘ্ন-স্বরূপ দাঁড় করাইবার জন্য মুসলমান

সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কিছু লোক পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধা হইল না। এই সুযোগের সুবিধা লইবার আশা যাঁহাদের ছিল তাঁহারা সামনে আসিয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন—মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের নামে। ইঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতে, অযৌক্তিকতা দেখাইতে বাদ-প্রতিবাদ জমিয়া উঠিল। এই বাদ-প্রতিবাদের ঝাঁঝে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই মনে করিতে লাগিল, যাঁহারা বাদ-প্রতিবাদ করিতেছেন তাঁহারাই বুঝি প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন, আর সম্প্রদায় হিসাবে বাঁচিতে গেলে ইঁহাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইতেই হইবে। সমগ্র ব্যাপারের পশ্চাতে যে কূট সরকারী নীতির হাত রহিয়াছে তাহা লোকে ভুলিয়া গেল। ইহার আর একটা প্রধান কারণ এই যে, সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার জন্য প্রথম আঘাত সুবিধাভোগীদেরই গায়ে লাগিল; তাঁহারা সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিতে রাজী ছিলেন না। যাহারা সুবিধার ভাগ লইতে আসিল স্বার্থে আঘাতের জন্য তাহাদেরই দায়ী করিলেন। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ১৯২৫ সালে নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম-সরকারী ইঙ্গিতে ও উৎসাহে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হইল, পরে—তাহারই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-মহাসভার আবির্ভাব ঘটিল। ভারতের বৃহৎ দুইটি সম্প্রদায়ের পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইবার ভিত্তি এইভাবে পাকা হইয়া গেল।

সাম্রাজ্যিকনীতির এই খেলায় আমরা বারবার ধরা দিতেছি ও ইহার বনিয়াদকে পাকা করিয়া দিতেছি। গোলটেবিল বৈঠকে পুনরায় ইহার অভিনয় দেখিতে পাই। বাছিয়া বাছিয়া এমন লোকদেরই আহ্বান করা হইল যাঁহারা নিশ্চিত সরকারী-নীতির সমর্থক হইবেন এবং সাম্প্রদায়িক বণ্টনে সুবিধার ভাগ বেশী পাইবার আশায় কেবলই দর

কষাকষি করিবেন। গান্ধীজীও নিমন্ত্রিত হইলেন। বলা হইল, নিজেরা আপোষ করিয়া একটা দাবী উত্থাপন করো—যদিও কর্তাদের ভাল করিয়াই জানা ছিল যে, আপোষ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সমস্ত জগতের ও স্বাধীনতাকামী ভারতের জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা হইল যে, যতই হৈচৈ করা হউক, সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া জাতীয় মুক্তি প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের জনসাধারণ তখন তীব্র সংগ্রামের পর কতকটা ক্লান্ত ও গোলটেবিল বৈঠক আহূত হওয়ায় শাসনতান্ত্রিক বড়-রকমের সুবিধা পাইবার আশায় প্রলুব্ধ। এই সন্ধিক্ষণে কৌশলে ফাঁদে ফেলিয়া সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে জাতীয়তাকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা হইল। এই অবস্থায় যাঁহারা বেশ-কিছু পাইবার আশায় ছিলেন তাঁহাদের সকল রাগ পড়িল—যাহারা সামনে থাকিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হইয়া সব পণ্ড করিয়া দিবার অভিনয়ে [কারণ আসলে কিছু পাইবার বা হারাইবার ছিল না] প্রধান অংশ গ্রহণ করিল—তাহাদের উপর। যাহারা পিছনে থাকিয়া পুতুল খেলাইল তাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল।

যাহাদের দিয়া পণ্ড করিবার অভিনয় করান হইল, তাহাদিগকে সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ধরিয়া লওয়ায় রাগ গিয়া সম্প্রদায়ের উপরই বর্তাইল। এই রাগ আরও বেশী করিয়া পাকা হইল যখন দেশের বিভিন্ন কোণ হইতে ছোট-বড় সুবিধালোভীরা ইহাদের কাজ সমর্থন করিয়া ইহাদেরই কথার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন! মনে হইতে লাগিল, যেন এক-একটা সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকেরা এক হইয়া ইহাদের পিছনে দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যতও অবশ্য অনেকটা তাহাই হইয়া গেল, কারণ গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষ্যে যে ব্যাপক আশা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহাই অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিল। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা

যেমন বেশী ছিল না ; তেমনি অর্থনৈতিক অসন্তোষ-পুষ্ট সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সুবিধাভোগী হিন্দুদের উপর ঈর্ষা ছিল অতীব তীব্র। কাজেই, সাম্প্রদায়িক নেতাদের কথায় তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন; সম্প্রদায়ের নাম করিয়া তাঁহারা সুবিধার যে বাড়তি ভাগ লইয়া আসিলেন তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলেন এবং তাঁহাদিগকেই সম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা বলিয়া মানিয়া লইলেন। পরে আইনের সাহায্যে তাঁহাদের প্রভাব ভালভাবে পাকা করিয়া লইবার সুযোগও পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দুদের মধ্যে দুই দল দুইভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন। এক—যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে সাম্প্রদায়িক এবং যেভাবেই হউক হিন্দুদের দিকে সুবিধার ভাগ বেশী দেখিতে চাহেন। ইঁহারা লোক-সংখ্যার অনুপাতে, শিক্ষা, যোগ্যতা প্রভৃতির অনুপাতে হিন্দুদের কী পাওয়া উচিত ছিল—হিন্দুদিগকে ঠকান হইয়াছে—ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের এই গাত্রদাহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেদের অবলম্বিত নীতির প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইবার আরও সুবিধা পাইলেন। আর দ্বিতীয় একদল যাঁহারা হিন্দুদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা বিশিষ্ট লোক তাঁহারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথায় জাতীয়তা খণ্ডিত হইল বলিয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের এই জাতীয়তাকে মুসলমানেরা মনে করিলেন—তাঁহাদের বঞ্চিত করিবারই ইহা একটা কৌশল মাত্র। সাধারণ হিন্দুদের উপরও ইহার যে প্রভাব বিস্তৃত হইল তাহাও কতকটা অনুরূপ। সাধারণ হিন্দুদের কাছে এই কথাই বড় হইয়া দেখা দিল যে, মুসলমানেরা জিতিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের হাতেই সব ক্ষমতা চলিয়া গেল। ইঁহারা হিন্দুদের ঐ দুই দলের কথার কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন না—সকলেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথার নিন্দা করিতেছে ইহাই ধরিয়া লইলেন ও

মুসলমানদেরই সব ব্যাপারের জন্য দায়ী করিতে লাগিলেন। সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া, যে ব্যাপার লইয়া সাম্প্রদায়িক লোভ ও অভিমান ফেনাইয়া উঠিয়াছে তাহা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে যাইয়া উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের কাছে জাতীয় নেতৃগণ সাম্প্রদায়িক নেতাদের সহিত পার্থক্য হারাইয়া ফেলিলেন। এই সময় মহাত্মাজী হিন্দু সমাজের জন্য যে উদ্বেগ দেখাইলেন, তাহাতে তিনি জাতীয়-নেতা হইতে হিন্দু-নেতার আসনে নামিয়া আসিলেন। জাতীয়তার নামেই হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার হইতে লাগিল।

শাসন-পরিচালন ব্যাপারেও সরকারী নীতির এই জালে আমরা নিত্য জড়াইয়া পড়িতেছি। এই প্রসঙ্গে ঘরের কাছে বাংলার ভূতপূর্ব্ব সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা করপোরেশন সংস্কার আইন, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিল—আসলে এইসব ক্ষেত্রে সরকারী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু, প্রকাশ্যত সরকারী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এই সকল চেষ্টা জনসাধারণের নিকট হইতে বাধা পাইত এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ বাড়িয়া যাইত। তাঁহারা ইহাতে এমন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন যাঁহারা তাঁহাদের অনুগ্রহলোভী ও সরকারী নীতির ইঙ্গিতক্রমেই চলিবেন। সেই ব্যক্তিদিগকে আবার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে স্থান দান করিলেন। ফলে, তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পক্ষে এক সম্প্রদায়ের জনমতের সমর্থন পাইয়া গেলেন। মুসলমানেরা ভাবিলেন, হিন্দুদের উপর টেক্কা দেওয়া যাইতেছে, আর হিন্দুরা মনে করিলেন সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিরোধ করিতে না পারিলে, সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। দুই সম্প্রদায়ের নেতা, উপনেতা ও সাধারণ লোকদের মধ্যে ইহা লইয়া বিপুল হট্টগোল

বাধিয়া গেল এবং সরকারী নীতি পরিকল্পনানুযায়ী সাম্প্রদায়িকতাকে দানা বাঁধাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে সরকারী রাজনীতির হাত ব্রিটীশ রাজনীতিকেরাও লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই। সাইমন কমিশন বলিয়াছেন. ব্রিটীশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের বসতি এক রকমের হইলেও—দেশীয় রাজ্যে সাম্প্রদায়িক তীব্রতা অনেক কম এবং ব্রিটীশ ভারতেও এক পুরুষ পূর্ব্বে ইহা ছিল না। অর্থাৎ স্পষ্টতই ইহা পরবর্ত্তী সরকারী নীতির দান।

সাম্রাজ্যের অন্যত্রও কোন কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির অনুসরণ করা হইতেছে। উত্তর আয়র্লাণ্ডে প্রটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে ঝগড়া—ইহার প্রমাণ। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বাহিরেও জনশক্তিকে খণ্ডিত ও বিভ্রান্ত করিবার জন্য এই নীতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত আছে। ১৯১৮'র পূর্ব্বে জার্ম্মাণ ও ইহুদীতে কোন বিরোধ ছিল না। হিটলার তাঁহার নিজের প্রয়োজনে ইহার আমদানী করিলেন। জার সরকারের অধীনে রাশিয়ায় ইহুদীদের উপর খুবই অত্যাচার চলিত—লোকে জানিত অসভ্য অশিক্ষিত স্লাভদের অত্যাচার হইতে ইহুদীদের রক্ষা করিতে সরকার অক্ষম। জার সরকারের পতনের পর পুলিশের গোপন নথি-পত্র হইতে জানা গেল যে, সরকারী গুপ্ত-নীতির সাহায্যেই এই সব অত্যাচার চলিত।

দশম অধ্যায়

মুস্‌লিম লীগ ও হিন্দু-মহাসভা

কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, বা কোন প্লাটফরমের সহায়তা ছাড়া সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কোন ভাবধারা বা আদর্শ দানা বাঁধিতে পারে না, শক্তি সঞ্চয় করিতেও পারে না। সাম্প্রদায়িকতার প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতারাও এই প্রয়োজনের তাগিদেই একদিকে মুস্‌লিম লীগ ও অন্য দিকে হিন্দু-মহাসভা গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত কোন পক্ষেরই সাম্প্রদায়িকতা সুসংহত শক্তিতে পরিণত হইতে পারিত না। প্রচার করিয়া, কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নানা উপায়ে ও নানা ধ্বনির সাহায্যে সাম্প্রদায়িক উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক শক্তির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বঞ্চনার ক্ষোভ কিছুদিন পূর্ব্বেই সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করিয়াছে। ইহাকে সম্বল করিয়া মুসলিম লীগের অবির্ভাব ঘটে। ইহাকে মূলধন হিসাবে খাটাইয়া নানা অনুকূল অবস্থার

সুযোগে লীগ আজ নিঃসন্দেহে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য অ-সাম্প্রদায়িক মুসলিম প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও প্রভাব নিতান্ত কম;— অন্যান্য অ-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য না হইলেও, একথা সত্য যে মুসলিম জনসাধারণের উপর লীগের প্রভাবই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দু সভার সৃষ্টি অনেক পরে হইয়াছে এবং প্রথম দিকে ইহার প্রভাব বিশেষ কার্য্যকরী বা ব্যাপক হইতে পারে নাই। জাতীয়তার সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট হয় নাই। হিন্দুরাই কংগ্রেসে শুধু সংখ্যা-প্রধান ছিলেন না; তাঁহাদের আদর্শে ও প্রভাবেই কংগ্রেস পরিচালিত হইয়াছে, কায়েমী স্বার্থের দাবীই সেদিন জাতীয় দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য কাহারও দাবীর সহিত কোন সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু, মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির জাগরণে, বিশেষ চেষ্টা ব্যতীত যখন হিন্দুদের প্রাধান্য ও সুবিধা রক্ষা দায় হইয়া উঠিল তখনই হিন্দু মহাসভার শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমানদের অনেক দাবী যখন কংগ্রেসকে মানিয়া লইতে হইল, অনেকেই তখন কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-মহাসভার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চাকুরী ও সুবিধার ভাগাভাগি হইবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদের মধ্যে ইহার প্রভাব খুবই বাড়িয়া গেল। হিন্দু-মহাসভাও এইভাবে আজ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং সরকারী নীতির কৌশলে দিনে দিনে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু, কোন প্রনিষ্ঠানই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক অন্যায় দাবী বা সরকারী নীতির সমর্থনকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে বেশী দিন প্রতারিত করিতে পারে না। বহু লোক আছেন যাঁহারা নিজ

কাজের জন্য যুক্তি চাহেন, আদর্শের প্রেরণা চাহেন। তাহা বাদে জনসাধারণকে বা বেশী সংখ্যক মানুষকে সুবিধা দেওয়া যায় না—একটা অসন্তোষকেও অনেক দিন ভুল পথে চালিত করা যায় না—নিজেদের সুবিধাবাদকেও চিরকাল লোকচক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হয় না। কাজেই মুসলিম লীগ ও হিন্দু সভা উভয়কেই নিজ নিজ আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে, আপাত-গ্রাহ্য যুক্তির সহিত তাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইয়াছে, প্রতীয়মান উচ্চ লক্ষ্যের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিতে হইয়াছে। আরও হইয়াছে—নিজেদের সুবিধাবাদকে—আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মপন্থা বলিয়া ব্যাখা করিতে—সুবিধাগ্রহণকে ত্যাগ স্বীকার বলিয়া লোককে বুঝাইতে এবং ব্যক্তিগত লোভকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পরিচয়-পত্র দিতে। এই দুঃসাধ্য সাধনের জন্য উভয় পক্ষই মিথ্যার সু-উচ্চ প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং বহুবার বহু কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া নানাভাবে প্রচার করিয়া তাহাকে সত্য ও বাস্তবের খোলস পরাইয়াছেন।

তাই আজ আমরা শুনিতে পাইতেছি এক-অখণ্ড জাতি বনাম দুই জাতি ; পাক-ই-স্তান বনাম অখণ্ড হিন্দুস্তান, হিন্দু সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বনাম মুসলিম সংস্কৃতি ও মুসলিম বৈশিষ্ট্য। এইভাবে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে—জীবনে যাহা কিছু মূল্যবান মনে করিতে শিক্ষা করিয়াছি, যাহার প্রতি আমাদের মমতা ও মনের টান আছে—যাহা কিছুকে আমরা মানবিক অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য ভাবিয়া আসিয়াছি—চরম আত্মোৎসর্গের দ্বারাও যেসব জিনিষকে রক্ষা করা উচিত বলিয়া আমরা ভাবি, তাহার সকলগুলিরই সহিত সাম্প্রদায়িকতাকে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই স্থূল এবং সূক্ষ্ম—জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে, সমাজের সর্ব্বস্তরে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জিনিষকে অবলম্বন করিয়া, হিন্দু-

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছে ও ব্যবধান দুরতিক্রম্য হইয়াছে। আর এই বিরোধ ও সংঘর্ষের উপর আসন পাতিয়া সুবিধাবিলাসীরা তৃতীয় পক্ষের সুবিধা করিয়া দিতেছেন এবং নিজেরা তাহার বিনিময়ে ভুক্তাবশেষ পাইয়া খুসী থাকিতেছেন। ইহাদের এক দল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা আর একদল হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা মুখে বলিতেছেন কিন্তু, আসলে তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণেরই কল্যাণের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

হিন্দু অথবা মুসলমান—যে-সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক, দেখা যাইবে উভয় সম্প্রদায়েরই বেশীর ভাগ লোক দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন ও অজ্ঞ। ইহাদের সবচেয়ে বড় অভাব হইতেছে অন্নবস্ত্র ও স্বাস্থ্যের। লোকের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, আর তাহার অভাবে লোকে-যে পশুর পর্য্যায়ে থাকিয়া যায়, একথাও সত্য। কিন্তু, অন্নবস্ত্র হইতেছে অঙ্ক শাস্ত্রের 'এক'এর মত ; ইহার অভাবে আর সব জিনিষেরই মূল্য মানুষের কাছে ফাঁকা হইয়া যায়—সব-কিছু ভাল জিনিষের অধিকার হইতে লোকে বঞ্চিত থাকে—পশুত্বের আরও বেশী নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত আমাদের দেশের জনসাধারণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি কোনটির অধিকার তাঁহাদের আছে ? কত দূরবর্ত্তী কালের মধ্যে কোনটির অধিকার তাঁহাদের পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত-ধারণা আছে যে, শিক্ষার প্রসার না হওয়ায়, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলির স্বাদ জনসাধারণ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। শিক্ষার বিস্তারই হইতেছে প্রতীকারের আসল পথ। এইজন্য কেহ মনে করিতেছেন, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে

দেশ প্রগতির পথে অগ্রসর হইবে ; কেহ-বা মনে করিতেছেন, দেশের শিক্ষিত যুবকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া জন-শিক্ষার চেষ্টা করিলে দেশের দুর্গতি দূর হইবে ;—কেহ কেহ-বা ভাবিতেছেন দেশে অসংখ্য স্কুল স্থাপন করিতে পারিলে ও প্রচারের ভাল ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা লোককে বুঝাইতে পারিলে তাহারা আপনা হইতেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারিবে ;—কেহ-বা অনুরূপ আরও নানা পরিকল্পনা করিতেছেন। যে-কোন পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই হউক না কেন, দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে যে উন্নতি হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু, দারিদ্র্য না ঘুচিলে, অন্নবস্ত্রের সংস্থান না হইলে কোন পরিকল্পনার সাহায্যেই লোককে শিক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না। কৃষক ও মজুরেরা এত দরিদ্র যে, তাহাদের ছেলে-মেয়েদের খাইতে দিবার সামর্থ্য নাই। শৈশব হইতে বাল্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা পিতামাতার কাজে সাহায্য করিতে হয়— অনেক ক্ষেত্রে অপরের বাড়ীতে কাজ করিয়া অন্নের আংশিক সংস্থান করিতে হয়। কাজেই, ভারতীয় কৃষকদের পুত্র-কন্যাদের জন্য যদি যথেষ্ট সংখ্যক অ-বৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, বিনা পয়সায় পুস্তকাদি দেওয়া হয়—তবুও তাহাদের পড়িবার সাধ্য নাই। আইন করিয়া পড়িতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে সে আইন অমান্য করা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই।

তাহাদের এই চরম অসহায় অবস্থার কথা তাহারা নিজেরাও বুঝে না —সম্ভায় যাহারা তাহাদের হিত-সাধন করিতে চায় এমন অনেকেও জানে না। এইজন্য যখনই তাহারা নিজেদের অবস্থার প্রতীকারের জন্য কোন রকম চেষ্টা করিতে চায় তখনই তাহাদিগকে বলা হয় যে, প্রতীকারের চেষ্টায়

কোন ফল হইবে না। যদি তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া যোগ্য হইতে পারে তবেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে। লেখাপড়া শিখিয়া যাহাদের দুঃখ ঘুচিয়াছে, এমন দুই-একটি উদাহরণের অভাব হয় না। এই ভুল যুক্তির ফাঁদে তাহারা সহজেই পা দেয় এবং যাহারা নিজেদের সুবিধার জন্য সরকারী নীতির বাহক 'সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা—তারপর আর সব' ধ্বনি তুলে তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায়। যতটা সম্ভব শিক্ষার সুযোগ জনসাধারণকে গ্রহণ করিতেই হইবে ; কিন্তু, তাই বলিয়া যাহারা বলে, অন্য সব কিছুর পূর্ব্বে শিক্ষা—শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চেষ্টা পণ্ডশ্রম,—হয় তাহারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য একথা বলে, না হয় দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক পরিচয় নাই। সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন ও প্রচেষ্টা হইতে জনসাধারণকে দূরে রাখিবার ইহা একটা খুব ভাল পন্থা বলিয়া—"সকল উন্নতির মূল শিক্ষা" এই কথার উপর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ জোর দিতেছে। শিক্ষার ব্যাপার যাহা দেখা গেল, সাম্প্রদায়িক যে-কোন শ্লোগানের বিচার করিলেই তাহাই দেখা যাইবে। পেটের ভাতের অভাবই জনসাধারণের আজকার দিনের সবচেয়ে বড় অভাব—অন্য যাহা-কিছু সবই তাহার পরবর্ত্তী।

মজার ব্যাপার এই যে, সাম্প্রদায়িক দুইটি প্রতিষ্ঠানই এই সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় সম্পর্কে কিছুই বলেন না—অথবা তাহাদের প্রাত্যহিক দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতীকারের পন্থা সম্পর্কেও নীরব। ইহার কারণ কী ? ইহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা এত বলিতেছেন, অথচ তাহাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থের কথা বলিতেছেন না কেন ? কেন না, সে কথা বলিবার তাঁহাদের উপায় নাই—তাহা সাম্প্রদায়িকতার কর্ণধারদের স্বার্থবিরোধী। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের দুরবস্থার প্রধান

কারণ হইতেছে শোষণমূলক সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা। দেশের যে কায়েমী স্বার্থ কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ করিয়া বাঁচিয়া আছে, আর এই কায়েমী স্বার্থের যাঁহারা মালিক অর্থাৎ গাঁতিদার, জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা, মহারাজা, নবাব, পুঁজিপতি প্রভৃতি বড় লোক, তাঁহারাই হইতেছেন, হিন্দু-মহাসভার ও মুসলিম লীগের কর্ণধারদের মধ্যে বড় দল। অন্য দল হইতেছেন, ছোট-বড় চাকুরিয়ারা, ক্ষমতা ও সম্মানের পদের অধিকারীরা। ইঁহারা সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট ও সাম্রাজ্যিক নীতির বাহক। শোষণ ব্যবস্থার উপরই এই নীতির ভিত্তি—সাম্রাজ্যিক স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই শাসন-তন্ত্রের কাঠামো রচিত ও এই ব্যবস্থাকে অটুটভাবে রক্ষা করাই ইহার একমাত্র স্বার্থ ও লক্ষ্য। এই শোষণেরও সর্ব্বশেষ পাত্র হইতেছে কৃষক ও শ্রমিক। কাজেই সাম্রাজ্যনীতির বাহকেরা জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিতে পারে না। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নাম করিয়া ইঁহারা নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতেছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; নিজেদের সুবিধা ছাড়া এই উপায়েও ইঁহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার একদিকে আছেন, দরিদ্র জনসাধারণ—যাঁহারা পরিশ্রম করেন—জিনিষ উৎপাদন করেন ও আরও নানা উপায়ে সমাজের সেবা করেন; অথচ, নিজেদের শ্রমলব্ধ জিনিষে যাঁহাদের অধিকার নাই—অতি সামান্য পারিশ্রমিক যাহা তাঁহারা পান তাহা নিতান্তই তুচ্ছ। অন্যদিকে তাঁহাদেরই শ্রমোৎপন্ন সম্পদে যাঁহারা সম্পদশালী হইয়াছেন—তাঁহারা রহিয়াছেন সমাজের অন্য প্রান্তে আর তাঁহাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন, ভারতীয় কৃষকের শ্রমলব্ধ সম্পদে পুষ্ট বিদেশী বনিক ও কারখানার মালিকগণ ও তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যতন্ত্র। কৃষক

শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের দুঃখের কারণই হইতেছে এই শোষণ ব্যবস্থা—সম্পদের এই ঊর্দ্ধমুখী ও বহির্মুখী প্রবাহ। কাজেই, তাঁহাদের দুঃখ দূর করিতে হইলে, সব দুঃখের মূল দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে এই শোষণ-প্রবাহ বন্ধ করিতে হইবে। সংঘবদ্ধভাবে এই স্রোত রোধ করিবার চেষ্টা করিতে না পারিলে, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে শোষিতেরা একযোগে ও সমেবেত ভাবে অগ্রসর না হইলে তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে না। আবার তাঁহাদের দুঃখের কারণ একবার তাঁহারা বুঝিতে পারিলে ও তাহা দূর করিবার জন্য সমবেত চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টাকে ঠেকাইয়া রাখাও কাহার পক্ষেই সহজ নহে। অথচ এই প্রকার চেষ্টা সফল হইলে, ইঁহাদের শোষণের উপর যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের সেই সুখের অবস্থা কাটিয়া যায়। কাজেই, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জনগণের সম্ভাবিত ঐক্যকে তাঁহাদের নষ্ট করা চাই হিন্দু সভা ও মুসলিম লীগের মধ্য দিয়া তাঁহারা তাহাই করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দু জনগণ ও মুসলিম জনগণের স্বার্থ এক ও তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারাই সেই স্বার্থ রক্ষা পাইতে পারে আবার মুসলিম জনগণের সহিত মুসলিম কায়েমী স্বার্থ ও সরকারী অনুগ্রহ পুষ্ট লোকদের সার্থ পরস্পর বিরোধী। একজনের যাহাতে লাভ অন্যজনের তাহাতে ক্ষতি, একজনের যাহাতে ক্ষতি তাহাতেই অন্যজনের লাভ আবার হিন্দু-জনগণের সহিত হিন্দু-কায়েমী স্বার্থ ও সরকারী অনুগ্রহ পুষ্ট লোকদের স্বার্থের একই প্রকার বিরোধী সম্পর্ক। শোষণের উপরই এই সমাজের ভিত্তি, সুতরাং যে-কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক না কেন, সেখানেই এই অন্তর্বিরোধ দেখা যাইবে। সকল সম্প্রদায়ের জনগণ যদি বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহাদের স্বার্থ

এক এবং এক ধর্ম্মের লোক হইলেও শোষক শ্রেণীর সহিত তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে, তাহা হইলেই বিপদ। হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের লোকেরা নানাবিধ প্রচারের দ্বারা জনগণের এই বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দু-সভার নেতারা যখন হিন্দু জনসাধারণের কাছে বলেন, সর্ব্বপ্রথম তাহারা হিন্দু এবং হিন্দু ধর্ম্মের যে-কোন লোক বা লোক-সমষ্টির সহিত তাঁহাদের নৈকট্য অনেক বেশী তখন তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ঐক্যের কোন জাগরিত সূত্র নাই বলিয়া, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, হিন্দু-সংস্কৃতি, হিন্দু-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ধোঁয়াটে আদর্শের কথা বলিয়া তাহাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইসব কথা শুনিয়া হিন্দু-জনসাধারণ মনে করেন মুসলিম-জনসাধারণ অপেক্ষা—হিন্দু বড় লোকেরা তাঁহাদের নিজেদের লোক এবং মুসলিম-জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। মুসলিম লীগও মুসলিম জনসাধারণের নিকট অনুরূপ কথা বলিতেছেন এবং তাহার ফলও অনুরূপ হইতেছে—এখানে ফল-যে আরও ভাল ফলিতেছে—তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, সাম্প্রদায়িক নেতাদের যে-চেষ্টা ও কার্য্য-কলাপের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা যদি বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হইত তাহা হইলে এতটা শক্তি সঞ্চয় করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। নানাবিধ মিথ্যা আদর্শবাদের ধোঁয়ায় ব্যাপারটির নগ্নতাকে দীর্ঘদিন ঢাকিয়া রাখা যাইত না।

হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম করিয়া দুই সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করিতেছেন এবং নিজেদের স্বার্থ ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ পুষ্ট করিতেছেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন

এবং নিজেদের নেতৃত্বাধীনে আনিয়া তাহাদিগকে তাহাদের বৃহত্তম স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ছোট বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে একদিকে হিন্দু-মহাসভা ও অন্যদিকে মুসলিম লীগের জন্য যে উৎকট আগ্রহ আছে এবং এক সম্প্রদায়ের সরকারী কর্ম্মচারীরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানিক নীতি ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে-মনোভাব পোষণ করেন তাহা লক্ষ্য করিলে যে-কোন সাধারণ লোকের কাছেও একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, কাহাদের স্বার্থের জন্য এই দুইটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছেন। যে-জনসাধারণের নিকট হইতে শোষণলব্ধ অর্থে ইঁহারা বাঁচিয়া আছেন এবং যে-জনসাধারণের [অবশ্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ের] স্বার্থের কথা ইঁহারা মুখে বলিতেছেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য ইঁহারা নিশ্চয়ই নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতেছেন না।

একাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা সংকল্প—হিন্দুসভা ও মুসলিম লীগ

যাঁহারা জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের দলে রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে, জনসাধারণের বৃহত্তম দাবীকে নিজেদের কর্ম্ম-তালিকা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। তাহা না করিলে, মনের এই জাগ্রত দাবী জনসাধারণকে একদিন দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগ উভয়কেই জনসাধারণের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মতালিকা প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। স্বাধীনতাকেই মূল লক্ষ্য করিয়া উভয় প্রতিষ্ঠানকে ঘোষণা করিতে হইয়াছে।

রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন হয় নাই অথবা কায়েমী স্বার্থও বিপন্ন হয় নাই ; সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাকেও এইভাবে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজন হয় নাই। রাজনীতিক আন্দোলনকে শক্তিহীন ও প্রতিহত করিবার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। রাজনীতিক আন্দোলন লোকের স্থির অচঞ্চল জীবনে

চাঞ্চল্য আনিয়াছে, দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন করিয়াছে, দুঃখ-কষ্টের অবসান হইতে পারে বলিয়া মনে আশা জাগাইয়াছে, আত্ম-শক্তি সম্পর্কে ক্ষীণ হইলেও বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছে ; সর্ব্বোপরি একথা সাধারণ লোককে বুঝাইয়াছে যে, যাহাই করা যাউক না কেন, স্বাধীনতা লাভ না হইলে, দুঃখ-কষ্টের মূল উৎপাটিত হইবে না। কোনো প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে সফলতার পথে লইয়া যাইতে হইলে লোকের এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া উপায় ছিল না। হিন্দুসভা ও মুসলিম লীগকে এবিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হইতে হইয়াছে। রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আন্দোলন যতই জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে ততই তাঁহাদের এই প্রয়োজন বাড়িয়াছে। এইজন্য জনসাধারণের মনে বর্দ্ধমান স্বাধীনতার ইচ্ছাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

হিন্দুসভা ও মুসলিম লীগকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে। হিন্দুসভার শক্তির প্রধান দুর্গই হইতেছেন মধ্যবিত্তেরা ; আর মুসলিম লীগ জনসাধারণের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেও, ইহারও প্রধান পতাকাবাহী হইতেছেন উদীয়মান মধ্যবিত্তেরা। রাজনীতিক আন্দোলনের আবর্ত্তে সবচেয়ে বেশী জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্তেরা এবং ইহা তাঁহাদের মনের অভ্যাস ও চিন্তাধারার উপর গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহাদের মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, রাজনীতিক কাজ বলিলে সে কাজকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখা, রাজনীতিক দুঃখভোগীদের, রাজনীতিক প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা তাঁহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। রাজনীতিক কারণে বা স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে যাঁহারা দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন এই সম্প্রদায়ের সাধারণ

লোকের মনে তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিয়া আছেন। হিন্দু মধ্যবিত্তদের সামাজিক জীবনের সহিত স্বাধীনতার আদর্শ এমনভাবে সংযুক্ত হইয়াছে যে, ইহা ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষা, মর্য্যাদা, আভিজাত্য ও অগ্রবর্ত্তিতার চিহ্ন হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। অন্যদিকে স্বাধীনতার আদর্শ মানেন না বা তাহার জন্য যথাসাধ্য করিতে ইচ্ছুক নহেন—এমন কথা ভদ্র-সমাজে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিতে লজ্জা বোধ করেন। যাহারা রাজনীতিক প্রচেষ্টা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন প্রকার বিরুদ্ধতা করিয়াছে বলিয়া লোকে জানে তাহাদিগকে কেহ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না অথবা সামাজিক মর্য্যাদাও দিতে চাহেন না। যে-সম্প্রদায়ের সাধারণ মনোভাব এই, তাহাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, আমরাও স্বাধীনতা চাই। তবে অন্যদের প্রদর্শিত পথে যদি স্বাধীনতা আসেও তবুও তাহাতে হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না—ইংরাজের পরিবর্ত্তে তাঁহারা মুসলমানদের অধীন থাকিয়া যাইবেন। অন্যদিকে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলে, তাহাতে স্বাধীনতা লাভ হইবে এবং হিন্দুরা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইবেন। হিন্দু-মহাসভা অবশ্য জাতীয়তার কথাও বলেন। তাহার কারণ হিন্দু-মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাতীয়তা কথাটি খুবই জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে ; আর ইহাতে ন্যায়বুদ্ধি-পরিচালিত নিরপেক্ষতার ভাণও করা যায়। হিন্দু-মহাসভা হিন্দুদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, তাহাদের যোগ্যতার উৎকর্ষ প্রভৃতির উপর যেভাবে জোর দেন তাহাতে জাতীয়তার নাম দিয়া সাম্প্রদায়িক সুবিধা গ্রহণে তাঁহাদের কোন বাধা নাই।

মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ অবশ্য খুব-বেশী ব্যাপ্তি লাভ করে নাই, আর উদীয়মান মধ্যবিত্তেরা সরকারী অনুগ্রহ ও

সুযোগের আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু বর্দ্ধমান গণচেতনার প্রভাব ইঁহারা অনুভব করিয়াছেন—স্বাধীনতা তাঁহারা চাহেন কিনা এবং কেন চাহেন না—এই প্রশ্নের সম্মুখীন ইঁহাদিগকে অবিরত হইতে হইয়াছে। উদীয়মান মধ্যবিত্তেরা সরকারী আওতায় বাড়িয়া উঠিলেও, ইঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও ইঁহাদের সকলকে প্রত্যক্ষভাবে সুবিধার লোভ দেখানো নিরাপদও নহে। ইঁহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্তিপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং অপকট কিছু-লোকের আবির্ভাব সম্ভব এবং তাহা হইতেছেও। একথা কাহাকেও বিশ্বাস করানো কঠিন যে, স্বাধীনতা লাভ ব্যতীত কোন সম্প্রদায়েরই পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে। অথচ, আন্দোলনকে সজীব রাখিবার জন্য এসব লোকের প্রয়োজন—কাজেই, ইঁহাদের যুক্তি ও বিবেককে শান্ত রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু লীগ-নেতাদের ইহার চেয়েও বড় চাপের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। স্বাধীনতার আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দুষ্কর। জনসাধারণের অভাব আছে, দুঃখের বেদনা আছে; এবং তাহা দূর করিবার তাগিদ আছে। ইহাদের এইসব দুঃখ ও বেদনার পশ্চাতে যে-অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থার চক্রান্ত রহিয়াছে তাহা জনসাধারণ ক্রমে বুঝিতে শিখিতেছে এবং সেকথা তাহাদের বুঝাইয়া দিবার লোকও জুটিতেছে। এ-অবস্থায় যদি বলা যায় যে, আমরা স্বাধীনতা চাহি না অথবা স্বাধীনতা ব্যতীতই এসকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সে-কথায় লোককে বেশী দিন ভুলানো যাইবে না। সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচার সত্ত্বেও-যে জনসাধারণ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কর্ম্মতালিকার দিকে ঝুঁকিতেছেন তাহাও ইঁহারা লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই। কাজেই, যে-ভাবেই হউক ইঁহাদেরও বলিতে হইয়াছে যে, ইঁহারাও

স্বাধীনতা চাহেন।—তবে যাহাতে তাহা সকলের ভোগ্য হইতে পারে, যাহাতে মুসলমানেরা তাহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হন, যাহাতে সংখ্যা-লঘুদের নিরাপত্তার ও স্বাতন্ত্র্যের গ্যারান্টি থাকে এমনভাবেই তাহা চাহেন।

এদেশে সাম্রাজ্যিক নীতির প্রধান কাহারা? ছোট গাঁতিদার হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় রাজ্যের নৃপতি পর্য্যন্ত ছোট-বড় সামন্তেরা ও সরকারী অনুগ্রহ-পুষ্ট ও অনুগ্রহ-লোভীরা। সরকারী অনুগ্রহেই ইঁহাদের জন্ম ও তাহার উপরই ইঁহাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, এইজন্য সাম্রাজ্যিক নীতিকে সফল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব ইঁহাদেরই উপর রহিয়াছে। কাজেই, ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন যে, জনগণের জন্য স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারে না তাহা খুবই স্পষ্ট,—তাহাদের পিছনে যতই মৌখিক প্রতিশ্রুতি থাকুক না কেন।

তবু ধরিয়া লওয়া যাক, ইঁহাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সদিচ্ছাপ্রণোদিত। উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ যতই অধিক সংখ্যায় এই দুইটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিবেন, ততই সেখানে বড় লোক ও সুবিধাভোগীদের পরিবর্ত্তে জনসাধারণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যাঁহারা নিজ স্বার্থ ও সুবিধার জন্য স্বাধীনতা চাহিবেন না—তাঁহারা ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইবেন। অনেক মধ্যবিত্ত হিন্দু গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা আনয়নের জন্য ২৫ কোটী হিন্দুই যথেষ্ট, তাহার জন্য মুসলমানদের খোসামোদ করিবার দরকার নাই। সম্ভবত অন্যদিকে মুসলমানেরাও অনুরূপ কথা ভাবিয়া থাকেন। রাজনীতিক চেতনা ও স্বাধীনতার ইচ্ছা কীভাবে সাম্প্রদায়িক খাতে আসিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে ও লোককে প্রবঞ্চনা করিতে পারে ইহা তাহারই একটা বড় দৃষ্টান্ত। যদিও ২৫ কোটী হিন্দুর বা কয়েক কোটী মুসলমানের—অথবা হিন্দু

সম্প্রদায়ের বা মুসসমান সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের—এক সঙ্কল্প লইয়া এক লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব তবুও তাহাই ধরিয়া লওয়া যাক। কোনো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণ-বিরোধী ও তাহাদের রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষা-বিরোধী হইবার অবশ্যম্ভাবিতার বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া যাওয়া যাক।

কংগ্রেসও স্বাধীনতা চাহিয়াছেন ও তাহার জন্য সংগ্রাম করিয়া আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তবে, তাঁহাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীনতা চাহিবার প্রয়োজন হইল কেন? এজন্য নহে যে, নূতন কোন রাজনীতিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া নূতন কোন পথে তাঁহারা যাত্রা করিতে চাহিতেছেন। হিন্দুরা বলিলেন, কংগ্রেস মুসলমানদের অন্যায় দাবী মানিয়া লইয়া হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। কাজেই, মুসলমানদের এইসব অন্যায় ও অসঙ্গত আব্দারের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া—মুসলমান সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়াই স্বাধীনতা আনয়ন করিতে হইবে। এই কথা যখনই বলা হইল তখনই যে-প্রশ্ন লইয়া পৃথক হওয়া গেল, স্বাধীনতা অপেক্ষা সেই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিল। সে-প্রশ্ন যদি এমন হইত যাহা নিশ্চিতরূপে স্বাধীনতার প্রশ্নেই গিয়া ঠেকিত, তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু, মুসলমানদের অন্যায় আব্দারের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য এই নূতন পথে পা বাড়ানো হইল। যাহা লইয়া গোলমাল হইল, মনকষাকষি হইল, এবং যাহার জন্য বিরক্ত হইয়া লোকে হিন্দু-সভার আদর্শ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল সেই প্রশ্নই স্বভাবত লোকের মনোযোগ অধিকার করিয়া বসিল। অর্থাৎ, সরকার ছাড়িয়া পাল্লাপাল্লি আরম্ভ হইয়া গেল মুসলমানদের সঙ্গে; আর তাহার উত্তর মিলিতে লাগিল মুসলীম লীগের মধ্য দিয়া। কিন্তু, কী লইয়া মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি?

নিশ্চয়ই স্বাধীনতা সংগ্রামে কে-কত বেশী অংশ গ্রহণ করিতে পারে—তাহা লইয়া নহে; কাহাদের আত্মোৎসর্গ ও অবদান কত বেশী তাহা লইয়াও নহে। দেশকে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য যে-শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা তাহাতে কাহার কত অংশ তাহা লইয়াই ঝগড়া। এই সুবিধা বাড়াইবার জন্য যতই তর্জ্জন করা যাক এবং গরম কথা বলা যাক, শেষ পর্য্যন্ত সরকারের করুণার উপর ভরসা রাখা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শেষ পর্য্যন্ত এই অনুগ্রহলাভেরই প্রতিযোগিতা বাধিয়া যায় এবং স্বাধীনতাই হউক আর স্বরাষ্ট্রিক শাসনের লক্ষ্যই হউক, সবই কাগজে কলমে থাকিয়া যায়।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, সুবিধার ভাগ সম্পর্কে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। মুসলমানেরা-যে বন্দেমাতরম্ অথবা শ্রী-পদ্ম প্রভৃতিকে আপত্তি করিয়া উগ্র-সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা জাতীয়তাকে খণ্ডিত করিতে চাহিতেছেন তাহা ঠেকাইবার জন্যই তাঁহারা মুসলমান-আতঙ্কগ্রস্ত কংগ্রেস ছাড়িয়া হিন্দু-মহাসভা গঠন করিতে বা তাহার পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মুসলমানদের অসঙ্গত দাবীর দীর্ঘতালিকা ইঁহাদের কণ্ঠস্থ আছে ; নিজ-কার্য্যের সমর্থনে ইঁহারা তাহাই আওড়াইয়া থাকেন। এই সকল দাবী উঠাইবার পিছনে এবং তাহার বিরুদ্ধতা করিবার প্রেরণার মূলে যে সুবিধান্বেষীদের হাত রহিয়াছে তাহা একটু চেষ্টা করিলেই অবশ্য দেখা যাইত। কিন্তু, তাহা বাদ দিয়াও একথা বলা যায় যে, এই সকল প্রশ্ন যখনই বড় হইয়া পড়ে তখনই মূল লক্ষ্য ক্রমেই দূরে সরিয়া যায়। এক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অন্য প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে—সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যাই লোকের কাছে একমাত্র প্রশ্ন হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িকতার আবর্ত্তে জাতীয়তার ও স্বাধীনতার আদর্শের অপঘাত মৃত্যু ঘটে। হিন্দু-মহাসভাও তাহাই করিতেছেন।

স্বাধীনতাকামী বহু হিন্দু যখন এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার আবর্ত্তে পড়িয়া সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে আলোড়িত করিয়া তুলেন তখন স্বাধীনতাকামী, জাতীয় আদর্শের অনুগামী বহু হিন্দু, স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তার অনুগামী মুসলমানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন [প্রকৃত স্বাধীনতাকামী হিন্দুদের হইতেও]; মুসলমানদের উপর ইহার যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহাতে তাঁহারাও প্রকৃত মুক্তিকামী হিন্দুদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান; এবং জাতীয় শক্তি ও মুক্তিপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃ-বৃন্দকে হিন্দুসভা হইতে হিন্দু জনগণ দূরে সরাইতে পারেন না—মুসলমানদের কল্পিত ভয়ে ক্রমেই বেশী করিয়া তাঁহাদের হাতের মধ্যে গিয়া পড়েন। হিন্দু-সভার আদর্শ ও কর্ম্মনীতি প্রয়োগের পথে এই-যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাও অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। যাহারা সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণে লাভবান হইতে চায় সেই বিদেশী ধনিকেরা এবং তাহাদের এদেশীয় তাঁবেদারেরা ব্যাপারটিকে উস্কানি দিয়া, উৎসাহ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, ঈর্ষার ভাব জাগাইয়া তীব্র করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সর্ব্বদা যত্নশীল। সুতরাং যাঁহারা সত্য সত্য মনে করেন যে, মুসলমানদের বাদ দিয়া ২৫ কোটী হিন্দুর পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত-পথে চালিত হইতেছেন। তাঁহারা একটা বিপুল সংখ্যা দেখিয়াই উৎসাহিত হইয়াছেন এবং সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছেন। হিন্দু-সভার জাতীয়তার কথা, স্বরাষ্ট্রিক-শাসনের কথা, স্বাধীনতার আদর্শের কথা সমস্তই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহাদিগকে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার আদর্শ হইতে সাম্প্রদায়িকতা ও সরকারী অনুগ্রহের চোরা-বালিতে আনিবার কৌশল মাত্র।

অন্যদিকে মুসলিম লীগও অনুরূপ কারণেই মুসলমানদের জন্য বা সকলের জন্য স্বাধীনতা আনিতে পারেন না। ইঁহাদের চেষ্টায় মুসলমান-জনসাধারণ হিন্দু-জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন এবং হিন্দুদের হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার কল্পিত প্রয়োজনে সুবিধান্বেষীদের হাতে গিয়া পড়িতেছেন। হিন্দুদের সহিত ঝগড়াতেই তাঁহাদের সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং সরকারী অনুগ্রহের আনুকূল্যে কিছু সুবিধা করিয়া লইবার আশায় মাতিয়া উঠেন। মুসলিম লীগের স্বাধীনতার আদর্শ আবৃত হইয়া যায়। স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে মুসলমান-জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিতে না পারে তাহারই জন্য স্বাধীনতার দাবীর পাল্টা জবাব হিসাবে মুসলিম লীগকে এই নূতন ধরণের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পাকিস্তান

সাম্প্রদায়িক মনোভাব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দানা বাঁধিয়া সংহত হইয়াছে। আর মুস্‌লিম সাম্প্রদায়িকতা পরিণতি লাভ করিয়াছে পাকিস্তানের দাবীর মধ্যে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে নানা প্রকারে উৎসাহ দিয়া ও সাহায্য করিয়া তীব্র প্রতিযোগিতা ও বিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা গিয়াছে। নানা সাময়িক প্রশ্ন ও সমস্যা তুলিয়া ইহার ইন্ধন যোগানো হইতেছে; সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি পার্থক্যের সূক্ষ্ম সুত্র আবিষ্কার করিয়া ইহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবারও চেষ্টা হইতেছে—কেন-না স্থূল জিনিষের ফাঁকি সহজে ধরা পড়িয়া যায় কিন্তু, সূক্ষ্ম জিনিষে আসিয়া লোকের মন আটকাইয়া যায়। তবুও সূক্ষ্ম জিনিষের অসুবিধা হইতেছে, জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব ততটা শক্তিশালী হয় না। এই জন্যই জনসাধারণের কাছে যাহার অব্যর্থ আবেদন আছে এমন প্রশ্নকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

এইদিক দিয়া পাকিস্তানের পরিকল্পনা খুবই কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। মুসলমানদের অনেক দুরবস্থার দায়িত্ব হিন্দুদের ঘাড়ে চাপানো গিয়াছে কিন্তু, প্রতীকারের উপায় কী? যেদিক দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাক তাহাদের একেবারে বাদ দিয়া চলা প্রায় অসম্ভব। কাজেই, বলা হইল মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস-ভূমি চাই—মুসলমানেরা কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন এমন দেশ চাই—অন্য কাহারও হস্তক্ষেপের ঊর্দ্ধে স্বাধীন অস্তিত্ব চাই—তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যাহাতে অন্যদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে সেজন্য পৃথক ইস্‌লামীয় প্রদেশ চাই। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে নানাবিধ সমস্যার চাপ রহিয়াছে ও তাহার সমাধানের জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা লোকে নিত্য অনুভব করিতেছে। হিন্দু মুসলমানের বাস পাশাপাশি। শুধু মুসলমানদের দলগঠনের দ্বারা এই চেষ্টা সফল হইবে কিনা—সে সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জাগিতেছে। কাজেই, সাম্প্রদায়িক নেতাদের বলিতে হইল, এ-সকলেরই সমাধান চাই, তবে মুসলমানদের জন্য পৃথকভাবে চাই। সর্ব্বোপরি মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রসারলাভ করিতেছে—ঘনীভূত সঙ্কটের দুঃসহ চাপ তাঁহারা ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছেন—দুঃখের মূল কোথায়। কাজেই, বলিতে হইল, আমরাও স্বাধীনতার প্রয়াসী—তবে সে স্বাধীনতা হইবে মুসলমানদের জন্য পৃথক স্বাধীনতা। কিন্তু, পাশাপাশি বাস করিয়া, নানা জাতির লোক লইয়া গঠিত একটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথকভাবে স্বাধীনতার কল্পনা কীভাবে করা যাইবে। ফলে পাকিস্তানের পরিকল্পনা হইল—স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিয়া এ-সমস্যার সমাধান করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন-যে সম্ভব নহে তাহা পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে। স্বাধীনতার ইচ্ছাকে বিপথে আনিয়া তাহাকে

ব্যর্থ করিয়া দিবার, তাহার দ্বারা মুক্তি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার ও এই শক্তিকে নিজেদের নেতৃত্বে রাখিয়া তাহার মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবার ইহা একটা সুকৌশল প্রচেষ্টা মাত্র। আপোষকামী জাতীয় নেতৃবর্গের সহিত দরকষাকষি করিয়া যাহাতে ইহারা সরকারী অনুগ্রহের মোটা ভাগ লইতে পারেন, ইহা তাহারও একটা কৌশল। মুসলিম জনসাধারণের কাছেও এমন-একটা অসম্ভব—অথচ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কাছে লোভনীয়—জিনিষ দেওয়া গেল—যাহাতে ইহার পিছনে তাঁহারা ছুটিতে থাকিবেন এবং অন্য সব জিনিষ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া যাইবেন।

তবুও, কিসের ভিত্তির উপর, কী প্রকারের যুক্তির উপর পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে গড়িয়া তোলা হইল এবং কীভাবেই-বা জনসাধারণকে ভুলানো গেল। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়া যে-সকল অবস্থার সমবায়ে ও সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার কথা আলোচিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রথম প্রকাশ হইতেছে, স্থানীয় এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ঐক্যে এবং তত্রস্থ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিরোধিতায়। মুসলিম লীগ ও হিন্দু-সভার মধ্যবর্ত্তিতায় ইহার মধ্যে একটা নিখিল ভারত যোগসূত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের এই নিখিল ভারত ঐক্য-বোধের উপরই পাকিস্তানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিনের পর দিন মুসলমানেরা শুনিয়া আসিয়াছেন, ধর্ম্মই তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অক্ষশক্তি। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবন আবর্ত্তিত হইবে। এই লক্ষ্যপথে তাঁহারা কতটা অগ্রসর হইলেন তাহার বিচারের দ্বারাই কোন জিনিষ সম্পর্কে তাঁহাদের লাভ-ক্ষতির পরিমাপ

করিতে হইবে। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ ভৌগলিক সীমার সহিত বিশেষভাবে জড়িত। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, একই ভাষা বলিয়া, একই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া একই ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া, একই দুঃখ-দুর্দ্দশার ভাগী হইয়া একই স্থানের হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। এই কথা ভুলিয়াই বাঙ্গালী-মুসলমানেরা বাঙ্গালী-হিন্দু অপেক্ষা পাঞ্জাবী বা গুজরাটী মুসলমানকে বেশী নিজের লোক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী-মুসলমান-কৃষক মনে করিলেন পাঞ্জাবের মুসলমান-জমিদারের সহিত তাঁহার স্বার্থের ঐক্য অধিক। এইভাবেই বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হইল। বলা হইল, ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ নহে। তবে জাতির গঠন, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী এমনভাবে নহে। বাঙ্গালী হউন, মারাঠি হউন, গুজরাটী হউন, পাঞ্জাবী হউন—মুসলমানমাত্রেই একজাতি আর হিন্দুরা নানা জাতিতে বিভক্ত। অন্যদিকে হিন্দু-সভা সমগ্র ভারতের হিন্দুদের এক সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া সমগ্র ভারতের অখণ্ডত্বের উপর জোর দিতে লাগিলেন। এই যে মতবাদ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ দুই অথবা মুসলমান ও অন্য একাধিক জাতির আবাস-ভূমি—এই যুক্তিই পাকিস্তান পরিকল্পনার মূলে রহিয়াছে।

কিন্তু, লোককে বুঝানো মুস্কিল। একই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধিকারী, একই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আগত বাঙ্গালী-হিন্দু বাঙ্গালী-মুসলমানেরা এক জাতি না হইয়া, ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের উত্তরাধিকারী পাঞ্জাবী বা গুজরাটী মুসলমান তাহার এক জাতির লোক হইবেন—এসম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। দৈনন্দিন জীবনে যাহাদের সহিত নিত্য কারবার, যাহারা

একই সুখ-সৌভাগ্যের সাথী, একই দুঃখের চাপে যাহারা পিষ্ট তাহাদের বাদ দিয়া অন্য লোককে আত্মীয় মনে করিতে হইবে ইহা স্বাভাবিক কথা নহে। সুতরাং এইসব স্থূল কথা বাদ দিয়া সূক্ষ্ম যুক্তি-জালের উপর, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দোহাই-এ পাকিস্তানকে খাড়া করিতে হইয়াছে। ইহাদের এই ধরণের যুক্তির নমুনার জন্য একজন বিশিষ্ট লীগ-নেতার একখানি পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"স্বাধীনতা ও প্রগতি বস্তু-সম্পর্ক-বিরহিত ধারণা মাত্র নহে অথবা ইহাদের শেষ ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ বিশেষ মানব সমষ্টির সহিত ইহাদের সম্পর্কের দ্বারাই ইহাদের অর্থ ও মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। যেখানে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বিভিন্ন মানব-সমষ্টির বাস—সেখানে প্রত্যেক দলেরই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী জিনিষ বাছিয়া লইবার এবং অপরের ক্ষতি না করিয়া বা অপরের উপর কিছু না চাপাইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমান অংশ দাবী করিবার অধিকার আছে। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের যে-সকল সীমারেখা রহিয়াছে তাহা অন্য যে-কোন স্থানের সমজাতীয় পার্থক্যের সীমারেখা অপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট। ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রে সুস্পষ্ট পৃথক ভূভাগ সমূহ রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র আবহাওয়া ও অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ রহিয়াছে। জাতিগত, সংস্কৃতিগত দল রহিয়াছে এবং ভাষাগত, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশিষ্টতা রহিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিভাগগুলি, এমন কি সঙ্কীর্ণ অর্থেও—সামাজিক, সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত পার্থক্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ভারতের নয়-কোটি মুসলমান সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে দাবী করা যাইতে পারে এবং ভালভাবে প্রমাণও করা

যাইতে পারে যে, ভারতের অন্য যে-কোন জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির উপাদান বেশী রহিয়াছে। ঐতিহাসিক সংস্কার, সাংস্কৃতিক সাধারণ উত্তরাধিকার ও সংস্কার, সাধারণ ভাষা, একই সামাজিক নীতি ও জীবনের আদর্শ, একই আইন-কানুন, একই নৈতিক চেতনা, একই রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ও ভাগ্য, যাহার কথাই ধরা যাক, ভারতবর্ষের মুসলমানেরা সর্ব্বাপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ ও সংহত জাতি। মুসলমানদিগের সুস্পষ্ট সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ রহিয়াছে এবং ইহা তাঁহারা কোন বাহিরের লাভের জন্য বিসর্জ্জন করিতে পারেন না। কারণ, ইস্‌লাম পাশ্চাত্য ধারণানুযায়ী ধর্ম্মমাত্র নহে—ব্যক্তি ও ঈশ্বর বা দেবতাগণের সহিত সম্পর্ক মাত্র নহে। ইসলাম জীবনের সুসম্পূর্ণ দর্শন—ইহার মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ রহিয়াছে—ইহা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানব-জীবনের সকল দিকেরই নিয়ামক। মুসলমানগণ, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছেন। অন্যদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে না চাহিলেও, তাঁহারা নিজেদের ভূখণ্ড, আবাস-ভূমি এবং রাজ্য পাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং এবিষয়ে তাঁহাদের সঙ্কল্প সুদৃঢ়। এখানে তাঁহারা নিজেদের আদর্শ ও প্রতিভা অনুযায়ী তাঁহাদের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন।” —অতএব উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের বাঙ্গলা ও আসামকে লইয়া তাঁহারা মুসলিম-ভারত গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রে যে সুস্পষ্ট পৃথক ভূভাগ সমূহ রহিয়াছে —ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র আবহাওয়া ও অর্থনীতিক বিশিষ্টতা রহিয়াছে, জাতিগত সংস্কৃতিগত দল রহিয়াছে এবং ভাষাগত, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশিষ্টতাও রহিয়াছে। কিন্তু, ইহার কোন্‌টিকে অবলম্বন

করিয়া জাতি সমূহের বিভাগ হইবে ? যদি ইহার সবগুলিকে পক্ষে পাওয়া যাইত তাহা হইলে ত কথাই ছিল না। অর্থাৎ যদি কোন-একটি বিশেষ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ধর্ম্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি এক হইত তাহা হইলে জাতি-বিভাগ সম্পর্কে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু বিপদ হইয়াছে, অন্য সর্ত্তগুলির যদিও-বা পূরণ হয়, ধর্ম্ম কোন-একটি বিশেষ ভূখণ্ডে আবদ্ধ নহে। কোন-একটি বিশেষ ভূখণ্ডের লোকের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক অতীত, অর্থনীতিক বিশিষ্টতা প্রভৃতি এক হইলেও ধর্ম্ম এক নহে। একই ধর্ম্ম দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কোন্‌টিকে অবলম্বন করিয়া জাতি-বিভাগ করা যাইবে ? এক দিকে ধর্ম্মের বন্ধনের ঐক্য, অন্য দিকে সমস্ত ঐহিক প্রয়োজনের বন্ধন (অবশ্য এমন নহে যে, এদিকে ধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়োজন আছে)। ভারতের বাহিরের ইস্‌লামিক দেশগুলির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, একই ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ভাষা, ভৌগলিক সীমাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। একই ধর্ম্ম হওয়া সত্ত্বেও মিশর, আরব, তুর্কী, পারস্য ও আফগানিস্থানের লোকেরা একই জাতিতে পরিণত হন নাই বা হইবার আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না। এই সকল দেশের ভাষা সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতার স্তর, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই সকলকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল দেশে আবার অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরও বাস আছে। ইহারা নিজ নিজ দেশের ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিতই এক জাতি হইয়াছেন। কিন্তু দুই দেশের একই ধর্ম্মের লোকেরা এক জাতি হইতে পারেন নাই।

শুধু-যে এই সকল দেশের অধিবাসীরা এক জাতিতে পরিণত হইতে পারেন নাই তাহা নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিদের মধ্যে যেমন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে; ইঁহাদের মধ্যেও তাহা ঘটিয়া থাকে—অতীতেও ঘটিয়াছে। ভিন্ন দেশীয় মুসলমান-শাসনকে অতীতে ও আধুনিক কালে মুসলমানেরাই পরাধীনতা মনে করিয়াছেন এবং ভিন্ন দেশীয় মুসলমান রাষ্ট্রের অধীনতা হইতে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্র বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—এবারও অনেকটা সেই লক্ষণই দেখা যাইতেছে। কাজেই একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে-সকল শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে ভারতের বাহিরে একই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন এবং নিজ নিজ দেশের ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত একই জাতিতে পরিণত হইয়াছেন—ভারতবর্ষেও সেই সকল স্বাভাবিক বিভাগের দ্বারাই জাতির সংজ্ঞা নির্ণীত হইবে।

তবু যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে, ধর্ম্মই জাতিবিভাগের ভিত্তি হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানেরা এক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবেন,—তাহা হইলেও প্রশ্নটা এভাবে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল না। কারণ আসল কথাটা বিভাগের নহে,—মূল সমস্যা হইতেছে কীভাবে জনগণের মুক্তি আসিবে, দুঃখ-দুর্দ্দশা ও শোষণের হাত হইতে কীভাবে তাহারা উদ্ধার পাইবে। কারণ, স্বাধীনতা লাভ না হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বা আত্মবিকাশের প্রশ্নই উঠে না। স্বাধীনতা লাভ হইলে স্বাধীনদেশে জাতিসমূহের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে কি না, তাঁহাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিপন্ন হইবে কি না, স্বাধীনতালাভের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের সে সম্বন্ধে আশ্বাস প্রয়োজন। বিভিন্ন

জাতির আবাসভূমি স্বাধীনদেশে কোনো জাতির জনগণের স্বার্থ বিপন্ন হইলে বা কোনো জাতির জনগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইতে পারিবেন—এ আশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু 'ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র হইতে পারিবেন' এবং 'স্বতন্ত্র হইতেই হইবে ও তাহার ব্যবস্থা এখনই পাকাপাকি করিয়া লইতে হইবে'—এই দুইটি কথা এক নহে। একটি হইতেছে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, অন্যটি হইতেছে জনগণের মধ্যে পার্থক্যের গণ্ডীটা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার অস্ত্র। পৃথক হইতেই হইবে এবং পৃথক হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই—এই সংকল্প যখন ঘোষণা করা হয় তখন অন্য সব সমস্যা চাপা পড়িয়া যায়,—পৃথক হইবার কথাটাই বড় হইয়া উঠে। জনগণ দুই বা বিভিন্ন-ভাগে ভাগ হইয়া পড়েন এবং ইহা লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া যায়। পাকিস্তানের দাবী লইয়াও তাহাই হইতেছে।

পাকিস্তানের দাবী—স্বাধীন ও স্বশাসক ভারতে মুসলিম-জনগণ ইচ্ছা করিলে পৃথক হইতে পারিবেন—এই প্রতিশ্রুতির দাবী নহে। যে-কোনো অবস্থায় এবং যে-কোনো মূল্যে মুসলমানদের পৃথক হইতেই হইবে, এই ধারণার উপরই ইহার ভিত্তি। মুসলিম প্রতিভা, মুসলিম সংস্কৃতি ও মুসলিম স্বার্থের বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগের জন্য স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের যে প্রয়োজনীয়তার কথা ইহার জন্য বলা হইতেছে—সেই স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক হইতেছে পরাধীনতা; —সে কথা ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। পৃথক যখন হইতেই হইবে তখন হিন্দুদের সহিত তাহাদের বুঝাপড়াটাই প্রথম সারিয়া লইতে হইবে,—এই ধারণাটা ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম-জনসাধারণ নিজেদের সর্ব্বতোভাবে এবং চিরতরে হিন্দু-জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতেছেন। বর্ত্তমানে নানাক্ষেত্রে একত্র কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তাকে অবাঞ্ছিত

অবস্থা বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদিগকে হিন্দুজনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করায় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা [যাহা কেবল মুসলিম লীগের লিখিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল নহে—পরন্তু সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সমগ্র জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভরশীল] ব্যাহত হইল এবং তাঁহাদের যে-দুঃখকষ্টের বেদনা স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টার মধ্যে একদিন রূপ লইত বা লইতেছিল—তাহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষোভেই নিঃশেষিত হইল।

পৃথক হওয়াটা একটা স্থিরীকৃত বিষয় না হইয়া যদি এমন প্রতিশ্রুতি হইত যে, স্বাধীনতালাভের পর জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে অথবা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে পৃথক হইতে পারিবেন, তাহা হইলে পৃথক হওয়া অপেক্ষা মিলিত থাকিবার কথাটাই বড় হইয়া উঠিত। উভয় পক্ষই মিলনের জন্যই উৎসুক থাকিতেন এবং যাহাতে পৃথক হওয়ার অবাঞ্ছিত প্রয়োজন না হয় সে জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। সে ক্ষেত্রে মিলন ও ঐক্যই হইত আদর্শ ও স্বাভাবিক অবস্থা, আর পৃথক হওয়ার প্রশ্নটা হইত অ-বাঞ্ছিত প্রয়োজন। আজ যেখানে পার্থক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মিলনের সূত্রগুলিকে সবলে ছিন্ন করা হইতেছে সেখানে মিলনের আদর্শের ও চেষ্টার মধ্যে —পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাসের মধ্যে—সহযোগিতা ও সহ-কর্ম্মীত্বের মধ্যে,—সন্দেহ, অবিশ্বাস ও পার্থক্য বিলুপ্ত হইত;—পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রীতি ও মর্য্যাদার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। মুক্তি প্রচেষ্টায় সহ-কর্ম্মীত্বের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের জনগণ নিজেদের স্বার্থের ঐক্য বুঝিতে পারিতেন।

পৃথক হওয়ার প্রশ্ন তখনই উঠিতে পারে যখন পৃথক হইবার সুবিধা নিজেরা ভোগ করা যাইতে পারে—অর্থাৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার

নিজেদের হাতে আসে। এই জন্য শুধু স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার সহিতই প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার না থাকিলে, আত্ম-বিকাশের সুযোগ হাতে আসে না। কিন্তু, স্বাধীনতার সম্পর্ক-নিরপেক্ষ হইয়া এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, শুধু-যে ইহা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে তাহাই নহে, তখন ইহা বিপদও ডাকিয়া আনিতে পারে। স্বাধীনতা লাভের সহিত যখন এই প্রশ্ন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা, যাঁহারা জাতিয় ঐক্যকে খণ্ডিত করিয়া লাভবান হইতে চাহেন, তাঁহারা ইহা হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হন। এই প্রশ্নের স্বরূপ নির্দ্ধারণের ভার যাঁহাদের উপর থাকে, জাতির ঐক্যই তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতার সহিত এই প্রশ্নের সম্পর্ক থাকিলে, যাঁহারা ইহা লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন, ইহাকে আকার দান করিবেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা চালিত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িবেন। জাতিয় শক্তিকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই ইঁহাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ রক্ষা পাইতে পারিবে। পাকিস্তানের সহিত স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নাই, আর তাহার ফলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রতি-ক্রিয়াশীল লোকদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার সহিত ইঁহারা মুসলমানের জন্য স্বাধীনতার একটা কাল্পনিক আদর্শ জুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু, তাহা-যে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান স্বাধীনতার ইচ্ছাকে বিপথে চালাইবার জন্যই উদ্ভাবিত, এবং মুসলমান অথবা হিন্দু কাহারও পক্ষেই-যে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতালাভ সম্ভব নহে—তাহা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে।

কাজেই যদি একথা ধরিয়াও লওয়া যাইত যে, ধর্ম্মের ভিত্তিতেই জাতি বিভাগ হওয়া উচিত—তাহা হইলেও পাকিস্তানের দাবীকে যেভাবে

উত্থাপন করা হইয়াছে, সেভাবে করা সকল সম্প্রদায়েরই জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইত।

তাহা হইলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে, ভারতবর্ষে জাতিগঠনের ধারা কোন পথে অগ্রসর হইবে? যদি ভারতবাসীরা একাধিক জাতিতে বিভক্ত হন, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে তাঁহাদের স্থান কী হইবে? তাহার পূর্ব্বে আধুনিক জাতি বলিতে আমরা কী বুঝি তাহা দেখিতে হইবে।

ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গেই আধুনিক অর্থে জাতিসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের সহিত বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে থাকেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশেও যখন সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের উপর ধনতন্ত্র জয়ী হইয়াছে তখনই প্রকৃতপক্ষে এই সকল দেশের অধিবাসীরা জাতিত্বের স্তরে পৌঁছিয়াছেন। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী এবং অংশত জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশগুলিতে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকায় এই সকল দেশের নবগঠিত জাতিগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে। এই সকল স্থানে সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের বিলোপ সাধন, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের উত্থান, এবং জাতিগঠন যখন আরম্ভ হয় তখন সমগ্র দেশব্যাপী ধনতন্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় ঘটিয়া একটি জাতি এবং ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। এইজন্য এই সকল স্থানে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের সমস্যা দেখা দেয় নাই। পরে যখন এই সকল দেশ সাম্রাজ্য-বিস্তার করিয়া এবং বহু উপনিবেশ অধিকার করিয়া বহুজাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে তখন অবশ্য সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, পূর্ব্ব ইউরোপে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জাতিয় রাষ্ট্র দেখা দেয়। এই সকল দেশে যখন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠিত হয় তখনও ধনতন্ত্রের প্রসার না হওয়ায় সেখানে সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য বিলুপ্ত হয় নাই। বিভিন্ন উপজাতি সমূহ, যাহারা তখনও জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই—তাহারা একই সাধারণ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে যখন এই সকল দেশে ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটিল তখন, তাহারা বহুজাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। অধিকতর উন্নত জাতিগুলি কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হইল এবং অপেক্ষাকৃত অপরিণত জাতিগুলি ইহাদের নিকট অর্থ-নীতিক ও রাজনীতিক পরাধীনতায় আবদ্ধ হইল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই ধরণের রাষ্ট্র ছিল। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় জার-রাষ্ট্রের উপর রাশিয়ান জাতির ধনিক শ্রেণীর আধিপত্য ছিল। ইহারা ফিন্, পোল, ইউক্রেনিয়ান, জর্জ্জিয়ান প্রভৃতি সংখ্যাল্প পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিগুলির উপর আধিপত্য করিত। এই সকল জাতিগুলি ঐ সময় গড়িয়া উঠিতেছিল মাত্র—কিন্তু তাহাদের পরিণতির পথে বহু বাধার সৃষ্টি হইয়া জাতিয় সমস্যার উদ্ভব হয়। সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তনের পরই এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি আত্ম-বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাইয়াছে এবং ইহাদের সকলের সমন্বয়ে গঠিত মিশ্ররাষ্ট্রে সংখ্যাল্পের সমস্যা চিরতরে লোপ পাইয়াছে।

জাতি-গঠনের এই মূল সূত্রের কথা মনে রাখিলে একথা বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমানে যাহাই হউক, পূর্ব্বে ভারতবাসীরা একটি মাত্র জাতি ছিলেন না। সামন্ত-তান্ত্রিক অনৈক্যের মধ্যেই তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং ধর্ম্মই সংযোগের সূত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে বহুবার কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য,

অশোকের সাম্রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্য—এমনই-সব কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। রাজপুত, মারাঠা অথবা শিখদের আধিপত্যও এক-একটি বিশেষ দলের আধিপত্য মাত্র। এইসব কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের দ্বারা রাজনীতিক ঐক্য সূচিত হইলেও, জাতি-গঠনের কোনো সহায়তা হয় নাই। ভারতে জাতীয়তার উদ্ভব আধুনিককালে হইয়াছে। কিন্তু, ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়া এখানে, ব্রিটীশ ধনিকগণ সামন্ত-প্রথাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ফলে, এখানকার জাতীয়তার বিকাশ জাতীয়তার স্বাভাবিক ধারা হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে।

কাঁচামালের যোগান পাইবার ও বাজারে পণ্য বণ্টন করিবার জন্য সাম্রাজ্যিক-নীতিকে রেলপথের বিস্তার-সাধন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, সেনাদল রক্ষা প্রভৃতি করিতে হইয়াছে। ফলে, সমগ্র দেশের মধ্যে ন্যূনতম রাজনীতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রেস, রেডিও, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সহায়তায় এই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু, সামন্ত-তন্ত্রকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিয়া সাম্রাজ্যিক-নীতি এই ঐক্যের ধারাকে এবং জাতীয়তার বিকাশকে ব্যাহত করিয়াছে; দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশে বাধা দিয়াছে। অবশ্য বাধা দিলেও সম্পূর্ণ রোধ করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে যে ন্যূনতম পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়াছে, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি যেভাবে ধ্বসিয়া গিয়াছে, তাহাতে সেই আঘাতের ফলেই ধনতন্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ধনতন্ত্রের বিকাশ এখানে বাধাগ্রস্ত হইলেও ধনিক-শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং ইঁহাদের স্বার্থ ক্রমে ব্রিটীশ ধনিক স্বার্থের (এখানে ইহা সাম্রাজ্যিক স্বার্থের আকার গ্রহণ করিয়াছে) বিরোধী হইয়াছে এবং

এই সময় রাজনৈতিক মঞ্চে শ্রমিক শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে এইভাবে জাতীয়তার অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে জাতীয়তা, স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তালাভের আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন হইতে গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতের ক্রম-বর্দ্ধমান জাতীয়তার প্রেরণা, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে এবং ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের দাবীর মধ্যে ইহা শক্তি সঞ্চয় করিয়া তুলিয়াছে। এই আন্দোলনের প্রচণ্ড ঐক্য-শক্তি, বিভিন্ন জাতি-বর্ণভুক্ত, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসী, বিভিন্ন-সংস্কৃতিসম্পন্ন ৪০ কোটী ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। ভারতে জাতি-সংগঠনের ইহাই হইতেছে প্রধান এবং মূল দিক। সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদ ও স্বাধীন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা ইহার লক্ষ্য এবং ভারতীয় জনগণের জাতিত্বে সংগঠিত হইবার পথে ইহা অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় সোপান। কৃত্রিম সাহায্যপুষ্ট সামন্ত-তান্ত্রিক অনৈক্যকে (যাহা সাম্প্রদায়িক বিরোধের রূপ গ্রহণ করিয়াছে) এই ঐক্যের শক্তির কাছে প্রবল বাধা হিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং জমিদার-শ্রেণীর, দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও সুবিধান্বেষীদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ আপোষের পথে গিয়াছেন বলিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমাজ-বিভাগের সহিত ভৌগলিক বিভাগের প্রশ্ন যেভাবে জড়াইয়া পড়িল তাহা দেখিতে গেলে আরও দূরে যাইতে হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী-বিহারী, অন্ধ্র-তামিল, মারাঠি-কর্ণাটকী, মারাঠি-গুজরাটী প্রভৃতি বিরোধের কথা সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে—বোম্বাই কাহার অন্তর্ভুক্ত—সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের, না বৃহত্তর গুজরাটের—তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে নূতন করিয়া গড়িবার আন্দোলন দানা

বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং ইহার ন্যায্যতা কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের পথে ইহা নূতন বিঘ্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। প্রদেশ সমূহে ধনিক ও জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর হাতে যে নামমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা নানা উপ-সম্প্রদায়ের ধনিক ও সুবিধালোভীদের মধ্যে যে-অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে প্রাদেশিক বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। অল্পোন্নত জাতি ও সম্প্রদায়গুলির মনে এই ভয় জাগিয়াছে যে, অধিকতর উন্নত জাতিগুলির দ্বারা তাহারা উৎপীড়িত হইবে। ইহা জাতীয় ঐক্যকে খণ্ডিত করিতেছে। কিন্তু, ইহাই এ-প্রশ্নের একমাত্র দিক নহে। ইহার গভীরতর ও অধিকতর অর্থপূর্ণ দিকও আছে।

সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয় চেতনার যে বিরাট শক্তিশালী প্রবাহ বিংশ শতকের প্রথমভাগে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে ধীরে ও নিশ্চিতভাবে গণ-আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে, তাহা প্রত্যেকটি জাতির জন-সমষ্টিকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। একদিকে যেমন ইহা—অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্য-বোধকে দৃঢ় করিয়াছে, আবার অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন উপ-জাতির নিজস্ব সত্তা অর্জ্জন করিবার, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিবার, নিজস্ব মাতৃভূমিকে বিশেষ মমতার সহিত দেখিবার, স্বতন্ত্র অর্থনীতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। এই দুইটি ভাবধারা পরস্পর-বিরোধী নহে এবং প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টি নির্ভরশীল। কারণ ভারতবর্ষের রাজনীতিক মুক্তি ব্যতীত এই দেশের বিভিন্ন জাতি ও উপ-জাতিদের পৃথক সত্তা অর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

কিন্তু, কী ভাবে প্রত্যেকটি উপজাতি নিজের বাসভূমিতে, নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত

করিবে ? তাহার জন্য যেমন একদিকে জাতীয় মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমনই অন্যদিকে জমিদারী মহাজনী প্রথা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদও অপরিহার্য্য। কেন না, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম্মই বৈষম্যের ভিত্তিরূপে কাজ করিয়াছে—আর নূতন জাতীয়তাবোধের আশ্রয়স্থল হইতেছে শ্রমশিল্পের বিকাশ। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অক্ষমতার ফলে এই উভয়বিধ অবস্থা তাল পাকাইয়া জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ইঁহারা সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন চালাইতে অনিচ্ছুক, এবং মুক্তি আন্দোলন হইতেও পিছাইয়া পড়িয়াছেন। জমিদারী স্বার্থের প্রতিনিধি সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে বিলম্ব করেন নাই। এক জাতীয় জনসমষ্টির পৃথক সত্তা অর্জ্জনের যে-অপরিণত ইচ্ছা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের (সামন্ততন্ত্র যাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছে) সহিত তাহাকে মিশাইয়া সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা এই পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বোধ আছে তাহার সহায়তায়, পৃথক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার ইচ্ছাকে বিপথে চালানো সম্ভব হইয়াছে এবং পাকিস্তান জনমতের একাংশের সমর্থন লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা মুসলমান জনসাধারণের কোন প্রকার মঙ্গল হইবে না, তাঁহাদের দাসত্বের শৃঙ্খল রচিত হইবে এবং শোষণের ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইবে মাত্র।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরেও হিন্দু অথবা মুসলমান কেহই সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। ভবিষ্যতের সম্মিলিত ভারতের একাংশের জাতীয় রাষ্ট্র বাংলার কথা যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভাষা এক, উভয়ের অর্থনীতিক

জীবন এক, সংস্কৃতিও প্রায় এক,—পার্থক্য কেবল ধর্ম্মে। যে-কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার; ইহাতে প্রত্যেক লোকেরই ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা থাকে: স্বাধীন মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও ধর্ম্ম অনুরূপ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কোনো সংহত জাতীয় রাষ্ট্রে যদি একাধিক ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের বাস থাকে, তাহা হইলে সেখানেই সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভবিষ্যৎ যুক্ত-কোরালা-রাষ্ট্রে মোপলারা একটি সংখ্যালঘু জাতি হিসাবে গৃহীত হইবেন। কিন্তু, তাহা এজন্য নয় যে, তাঁহারা ধর্ম্মে মুসলমান—তাহা এইজন্যই যে, তাঁহারা একটি পৃথক জাতি—যাহাদের ভাষা ও জীবনযাত্রা অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র। মহারাষ্ট্রে বা গুজরাটে যুক্ত-প্রদেশ হইতে আগত উর্দ্দুভাষী মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত হইবেন।

কথা উঠিবে, পাকিস্তানের দাবী যখন জমিদার, নবাব ও নাইটদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তখন কেন ইহা ব্রিটিশ সর্ব্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি লাভ করিতেছে না। এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর নামমাত্র ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রভাবের দ্বারা এদেশের জনগণকে শৃঙ্খলিত রাখিতে পারিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ এখনও আশা করেন। হিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের ভয় দেখাইয়া বাগে আনিবার অস্ত্র হিসাবেও ইহাকে এখন ব্যবহার করা যাইতেছে। এইজন্য উৎসাহ দিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেও কর্ত্তৃপক্ষ এখনও ইহাকে মানিয়া লন নাই। জনগণের মুক্তিপ্রচেষ্টার চাপে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঐক্যের যদি কোনো দিন ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহা হইলে সেই দিনই এই অস্ত্রের ব্যবহার হইবে।

ভারতীয় জনগণ অথবা শুধু মুসলিম জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণের কথা যদি ধরা যায় তাহা হইলে, পাকিস্তানের দাবীকে কোনো দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য বলা যাইবে না। মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই ইহার উদ্ভব।

পাকিস্তানের স্বপ্ন যতটুকু প্রশ্রয় পাইয়াছে তাহাতেই সমগ্র ভারতের সমস্যাসমূহ আরও জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যেই ইহারই অনুরূপ যে পাল্টা দাবীর রব শোনা যাইতেছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে অথবা ভারতের সমস্যা জটিলতর করিতে তাহাও কিছু-কম নহে। এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অখণ্ড হিন্দুস্থান

পাকিস্তান আন্দোলনের পাল্টা জবাব হিসাবে অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, ইহার মধ্যে দোষের কিছু নাই। কারণ, পাকিস্তান আন্দোলন যদি সমর্থনযোগ্য না হয় এবং জনগণের স্বার্থবিরোধী হয় তবে তাহার বিরোধী আন্দোলন ত জনস্বার্থের অনুকূলই হইবে। ভারতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যদি অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংযুক্ত রাখার চেষ্টা ত একান্তই প্রয়োজনীয়। অখণ্ড হিন্দুস্থান সম্বন্ধেও এই ভাবের যুক্তি আমাদের সাধারণ লোকের মনে আসিয়া থাকে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারাও এই যুক্তির দ্বারাই পরিচালিত হন।

কিন্তু, অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলনের মূলেও আসলে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা রহিয়াছে এবং পাকিস্তান দাবীর পাল্টা দাবী হিসাবেই ইহা উত্থাপিত হইয়াছে। তবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবটা এখানে প্রচ্ছন্ন

রাখা সম্ভব হইয়াছে ; এবং এই অসাম্প্রদায়িক আবরণে উপস্থিত কর গিয়াছে বলিয়াই ইহাতে জনসাধারণের বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কাও বেশী রহিয়াছে। দেশের অধিবাসীরা যদি সাম্প্রদায়িকভাগে বিভক্ত থাকেন বা তাঁহাদের উপর সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে এবং সেখানে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে—যেমন ভারতবর্ষে হিন্দুদের আছে, তাহা হইলে সেখানে প্রতীয়মান, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অর্থই হইতেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়গুলির উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন। এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের দ্বারাই অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলনের দ্বারা হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ান হইতেছে এবং অন্যদিকে মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে দেওয়া হইতেছে। কথাটার আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

আমাদের শাসকেরা আমাদের শাসন করিবার অজুহাত স্বরূপ বরাবর এই কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা একটি জাতি নহে, তাহারা পরস্পর কলহরত নানা সম্প্রদায়, নানা ধর্ম্ম, নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্যের সূত্র নাই। কাজেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার তাহারা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। তাঁহাদের কথা হইতেছে, ব্রিটিশ অভিভাবকত্ব না থাকিলে ভারতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিত এবং ভারত শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। অল্পদিন পূর্ব্বেও আমেরি সাহেব ভয় দেখাইয়াছেন, স্বাধীনতা দিলে ভারত আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধে ফিরিয়া যাইবে! ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ধারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে এই উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মুক্তিপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া জাতীয় চেতনার বিপুল শক্তি

ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্যের শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা দেখিতে হইবে।

গত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের উপর নির্ভরশীল উদারনীতিকগণ এবং তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত তৎকালীন ধনিকগণ ইংরেজ শাসনের মহিমা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের অযোগ্যতা দ্রুত দূর হইয়া যাইতেছে এবং ভারতবাসীরা দ্রুত জাতিহিসাবে গড়িয়া উঠিতেছেন। কাজেই তাহাদিগকে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া উচিত। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ভারতের নবীন ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের সহিত সাম্রাজ্যিক স্বার্থের বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কারণ এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারই ছিল এদেশের ধনিকশ্রেণীর কাম্য এবং ইহাই ছিল আবার ব্রিটিশ-ধনিকবর্গের স্বার্থের অন্তরায়। ১৯০৭ সালের কাছাকাছি সময় এই স্বার্থসংঘাতের ফলে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল প্লাবন দেখা দেয়। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে এবং ক্রমে গণ-আন্দোলনের মধ্যে প্রসারিত হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরই এদেশের সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারই মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাগের মূল নিহিত আছে। ভারতবর্ষে যে নবীন জাতীয়তার উদ্ভব হইল, শিল্পের বিকাশের সহিত তাহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এবং ভারতের ধনিকশ্রেণীই তাহার নেতা। কাজেই ইহারা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং জাতি, ধর্ম্ম, প্রদেশ নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর ঐক্যের উপরই ইহাদের ঝোঁক বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। ভারতবাসীরা-যে একজাতি, বহু জাতিতে বিভক্ত নহেন, এই এক জাতীয়তা-যে তাঁহাদের পক্ষে নূতন কথা নহে, ভারতের ধর্ম্ম,

সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কোন যুগের রাজনীতিক ঐক্যের নজীর দেখাইয়া তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টা নবজাত ধনিকশ্রেণীর দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল এবং নূতন জাতীয়তার আদর্শে ইহা অনুপ্রাণিত হইতেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীরা-যে একই ভারতীয় মহাজাতির অংশ—প্রায় সকল ভারতবাসীই এই কথা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। সামন্ত-প্রথার ধ্বংসের উপর ধনতন্ত্রের প্রচেষ্টা এবং দেশের মুক্তিপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই জাতীয়তার বিকাশ। কাজেই এই জাতীয়তার ধ্বনি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিল। শিল্পের বিকাশের সহিত জাতীয়তার বর্দ্ধমান শক্তির কাছে সাম্প্রদায়িকতার পরাভব ঘটিতেছিল। মুক্তিসংগ্রামের প্রবল ধাক্কায় সাম্প্রদায়িকতার সীমা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এই অগ্রগতি সরল রেখায় অগ্রসর হইতে পারিল না। মুক্তিসংগ্রামের পথে নূতন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল; ধনিক-নেতৃত্ব সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া আপোষের পথে সরিয়া দাঁড়াইল। এই সময় সরকারী সাহায্যপুষ্ট সামন্ত-শক্তির সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা নূতন করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিল। কেন এমন হইল ?

শিল্পের বিকাশের সঙ্গে এক দিকে যেমন ধনিকশ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বিদেশী ধনিক-স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধ স্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতে লাগিল অন্যদিকে তেমনই রাজনীতিক মঞ্চে শ্রমিক-শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল। শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং মুক্তিপ্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল। রাজনীতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রবেশের ফলে মুক্তিপ্রচেষ্টার গতিও সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্রপথ অবলম্বন করিল। ধনিক

শ্রেণী উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে বিদেশী ধনিকশ্রেণীর সহিত তাঁহাদের স্বার্থের সংঘাত অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর সহিত স্বার্থের দ্বন্দ্ব। রাজনীতিক মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব এতদিন তাঁহাদের হাতে ছিল, এখন তাহাতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। ধনিকশ্রেণী শ্রমিকদের এই অভ্যুদয়ে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের ভয় হইল, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমেই শ্রমিকদের হাতে গিয়া পড়িবে। ফলে, তাঁহারা আপোষনীতির আশ্রয় লইলেন এবং সংগ্রামের পথ ত্যাগ করিয়া সামন্তপ্রথার সঙ্গে রফা করিলেন। সাম্রাজ্যের কর্ণধারেরা সামন্তশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দিয়া জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর সামন্তদের আসন যাহাতে পাকা হয় তাহার জন্য শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টন করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাকে-যে জাতীয়তার বিরুদ্ধে অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে, একথা সবার কাছেই খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়িল ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা নানা ভুলপথে চলিতে লাগিল। কিন্তু, সামন্ততন্ত্র-যে সাম্প্রদায়িকতার মূলভিত্তি, একথা সাধারণ লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। শ্রমিক আন্দোলনে ভীতিগ্রস্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অস্বীকার করিয়া সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদে নিজেদের অসামর্থ্য প্রমাণ করিলেন।

ধনিকশ্রেণী সামন্তদের সহিত রফা করিয়া সাম্রাজ্যিক নীতিকে সফল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু, শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া মুক্তি-আন্দোলনকে নূতন পথে লইয়া চলিল। সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই আন্দোলনের একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়ায়, সাম্প্রদায়িকতাকে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সম্মুখে

পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহা দেখা গিয়াছে যে, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, বিশেষ করিয়া কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ভেদসৃষ্টিকারীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ নিজেদের স্বার্থের ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সম্মিলিতভাবে প্রতিপক্ষের শক্তি ও কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। জাতীয় আন্দোলনে আপোষকামী ধনিক-নেতৃত্ব যখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার বেড়াজালে পদে পদে বাধা পাইয়া জড়াইয়া পড়িতে লাগিল তখন নূতন পথে তাহার সমাধানের ইঙ্গিতও উপস্থিত হইল। জাতীয় নেতাদের মুখে অসাম্প্রদায়িক কথা শুধু-যে অর্থহীন হইয়া পড়িল তাহা নহে, ইহা সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক হইয়া পড়িল।

অসাম্প্রদায়িক কথা এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করিতে লাগিল; ইহাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অস্বীকার করা হইল, সামন্ত শ্রেণীর সহিত আপোষ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিকে মানিয়া লওয়া হইল এবং লোকের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে অবাধে তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিবার সুযোগ দেওয়া হইল। সাম্প্রদায়িক নেতারাও এই সুযোগ ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁহারা নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধ্বনি তুলিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে বলিতে লাগিলেন যে, এই উপায়েই তাঁহাদের দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। অন্য কোন আদর্শ বা কর্ম্মপন্থা জনসাধারণের সম্মুখে না থাকায় তাঁহারা বা তাঁহাদের একাংশ সহজেই বিপথে চালিত হইতে লাগিলেন। মুক্তিপ্রচেষ্টা যখন শিথিল হইয়া পড়ে এবং জাতীয় নেতারা সাম্রাজবাদ ও তাহার প্রধান মিত্র সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অস্বীকার করেন তখন এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দেশে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে ধারণা আছে যে, তাঁহাদের একদল মুসলমান ও আর একদল হিন্দু, সেই ধারণা কোন স্থানে হইতে আঘাত প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একই জাতির লোক এবং তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা-যে অসুবিধায় পতিত হইবেন, এ সন্দেহও স্বাভাবিক। হিন্দু সভার ও কংগ্রেসের জাতীয়তার ধ্বনি স্বতঃই তাঁহাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়াছে। হিন্দ মহাসভার জাতীয়তার ধ্বনি সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রসূত। সম্প্রদায় হিসাবে-যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ একথা তাঁহারা জানেন। সাম্প্রদায়িক বিভাগকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা-যে লাভবান হইবেন, একথাও তাঁহারা জানেন।

হিন্দুদের প্রায় সকল দলের লোকেরাই জাতীয়তার আদর্শে বিশ্বাসী। হিন্দুসভা স্পষ্টত একই সঙ্গে জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ প্রচার করিতেছেন। জাতীয়তার ধ্বনি বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদের সহায়ক না হইলে তাঁহারা ইহা কখনই ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা একথা বুঝিতেছেন, যতক্ষণ দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অস্তিত্ব রহিয়াছে,—দেশের লোক হিন্দু, মুসলনান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত আছেন,—এবং বিনা-সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী লোকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে,—ততক্ষণ জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারাই লাভবান হইবেন। হিন্দু প্রাধান্যে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাও এই আশাতেই জাতীয়তার পক্ষপাতী। ইঁহারাই আবার মুসলিম দাবীর অন্যায্যতা ও অতিশয়তার

প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের গণতন্ত্র-বিরোধীতার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দু-প্রাধান্যে বিশ্বাসী হইয়াও ইঁহারা যে-কারণে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসীও সেই একই কারণে গণতন্ত্রের বিরোধী।

জাতীয়তায় বিশ্বাসী কংগ্রেসীরাও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধীতা করিতেছেন ; কিন্তু, আসলে তাঁহাদেরও কথা ও কার্য্যের দ্বারা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হইতেছে এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা কংগ্রেসকে হিন্দু সভার প্রভাবাধীন বলিয়া প্রচার করিবার সুবিধা পাইতেছেন। কেন না জাতীয় নেতৃবৃন্দ সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া জাতীয়তার উৎসমুখ অবরুদ্ধ করিয়াছেন এবং সামন্তপ্রথার সহিত আপোষ করিয়া কার্য্যত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের অ-সাম্প্রদায়িকতা অর্থহীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের অ-সাম্প্রদায়িকতার সংঘর্ষ প্রধানতঃ অ-সাম্প্রদায়িক মুখোসপরা হিন্দু প্রাধান্যভীত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সহিতই হইতেছে। কাজেই ইঁহাদের নিকট হইতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা পরোক্ষ (এবং হয়ত ইঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও,) সাহায্য ও পুষ্টি লাভ করিতেছে। হিন্দুরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বলিয়াই জাতীয়তার ধ্বনির অন্তরালে নিজেদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ পাইয়াছেন আর ইঁহাদের এই সুযোগ রহিয়াছে বলিয়াই অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলনের পশ্চাতে যে হিন্দুসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ক্রিয়া রহিয়াছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হইবার চেষ্টা রহিয়াছে সে কথা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়। জাতীয় নেতৃবৃন্দ যদি সংগ্রামের পথ পরিহার না করিতেন তাহা হইলে জাতীয়তার পথ বাধা-মুক্ত হইত এবং অ-সাম্প্রদায়িক জনগণ প্রতিদিন নিজেদের স্বার্থের ঐক্য

উপলব্ধি করিতে পারিতেন,—সাম্প্রদায়িকতাকে যাহারা রক্ষা করিতে চাহেন সেই প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িতেন।

অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ কী ভাবে করিতেছে? ব্রিটীশ রাজনীতিকেরাও ভারতকে সংহত ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে রাখিতে চাহেন। নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই তাঁহাদিগকে ভেদসৃষ্টিকারী শক্তিকে উৎসাহ দিয়া হাতের কাছে ব্যবস্থা-পোযোগী করিয়া রাখিলেও আজও তাহার দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন হইতে দেন নাই। যদি বিপদ আরও ঘনীভূত হয়, অর্থাৎ ভারতের জাতীয় ঐক্যের শক্তি তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তখনই হয়ত ইঁহারা পাকিস্তানের দাবীর কাছে আত্মসমর্পন করিবেন। কিন্তু, ব্রিটীশ রাজনীতিকগণ কোন্ শক্তির আওতায় ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে চাহেন, এই কথা যাচাই করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের জমিদার, নবাব, দেশীয় নৃপতি ও সুবিধা প্রত্যাশী বড় লোকেরাই এদেশে ব্রিটীশ শাসনের প্রধান মিত্র এবং তাঁহাদের সহায়তায় ভারতকে কেন্দ্রীভূত শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। এই ঐক্য ভারতের গঠনশীল জাতীয় ঐক্য নহে বরং ভেদসৃষ্টিকারী শক্তির ছদ্মবেশ। ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন সম্পর্কে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই জাতীয় ঐক্যের অবস্থিতি হইতেছে জাতীয় মুক্তিপ্রচেষ্টার মধ্যে: তাহারই মধ্যে নিহিত হইতেছে ইহার প্রাণশক্তি। কাজেই, মুক্তি সংগ্রামের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক ঐক্যের আন্দোলনের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের সম্বন্ধ নাই, উহা ভেদসৃষ্টিকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হইবার চেষ্টা মাত্র।

অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলন ভারতের ঐক্যের ধারাকে অন্যভাবেও ব্যাহত করিতেছে। শিল্পের বিকাশের সহিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা, ভৌগলিক সীমা, মানসিক গঠন প্রভৃতিকে ভিত্তি করিয়া জাতি সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী, মারাঠি, পাঞ্জাবী, প্রভৃতিকে আমরা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে দেখিতে পাইতেছি। পৃথক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য ইঁহাদিগকে এই স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। একদিন ঐ স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্তির দিকে যাইবে কিনা তাহা এখানে আলোচ্য নহে। বর্ত্তমানে এই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতবর্ষে এই সকল স্বতন্ত্র জাতীর অস্তিত্ব বাস্তব অবস্থামাত্র ; বাধাগ্রস্ত শিল্পের বিকাশের সহিত জাতিগঠনের কার্য্য বাধাগ্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, উপসাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি নানা অনৈক্যবাহী শক্তি মাথা তুলিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের সহিত এই জাতি-গঠনের কার্য্য পূর্ণতালাভ করিবে। কিন্তু, আজ ইহারা কেহই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে রাজী নহেন। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে, ভারতে শিল্পের বিকাশ সর্ব্বত্র সমানভাবে হয় নাই এবং জাতিগুলি সকলে ইহাতে সমান অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিগুলির স্বভাবতঃ এই ভয় হইয়াছে যে, অগ্রবর্ত্তী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলির দ্বারাই তাঁহারা নির্য্যাতীত হইতে পারেন ; তাঁহাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি চাপা পড়িয়া যাইতে পারে। সারা ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দীকে চালাইবার চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাও লক্ষ্য করিবার মত।

অখণ্ড হিন্দুস্থানের ধ্বনি জাতিগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে বাধা জন্মাইয়া জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং প্রাদেশিক

অভিমান জাগাইয়া তুলিতেছে। বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র বিকাশের সুযোগ দান ভারতের জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী নহে। কিন্তু, এই সুযোগের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হইয়া গেলে, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ইহা ভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির যন্ত্র হিসাবে কাজ করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় অখণ্ড ভারতের ধ্বনির দ্বারা অনৈক্যের শক্তিই পুষ্টি লাভ করে এবং ভেদ সৃষ্টিকারিগণ সুবিধা পাইয়া থাকেন। কাজেই, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করিতে গেলে, ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগলিক সীমার ভিত্তিতে এখানে বাঙ্গালী, মারাঠি, পাঞ্জাবী, গুজরাটী প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাদের পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এমন কি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের অধিকারও স্বীকার করিতে হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিরও ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

এখানেও অবশ্য মূল কথাটা মনে রাখিতে হইবে। অবস্থা নিরপেক্ষভাবে যদি স্বতন্ত্র হইবার নীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং তাহারই ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলে প্রাদেশিকতাই বাড়িয়া যাইবে। ভারতীয় জনগণের পক্ষে মুক্তিলাভই সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন এবং জাতীয়তা বিকাশের মূল কথা। এই মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়াই সকল অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণের সময় জনগণ নিজেদের স্বার্থের ঐক্য বুঝিতে পারিবেন। জনগণের অনৈক্যকে কাজে লাগাইয়া যাহারা নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে চাহে, ক্ষমতার আসন হইতে তাহারা ক্রমেই দূরে সরিয়া যায় এবং জনগণকে শোষণ করিবারও কেহ থাকে না। এ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাই বড় হইয়া দেখা দেয় এবং আত্মবিকাশের উপযোগী যে ন্যূনতম স্বাতন্ত্র্য তাহার অধিক দাবী করিবার কাহারও প্রয়োজন থাকে না।

একথা দেখা গেল, ভারতবর্ষে মুক্তিপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই জাতীয়তার বিকাশ—ইহাই এক মাত্র ঐক্যবাহী শক্তি। আর ইহার অপর দিকে রহিয়াছে সাম্রাজ্যিক সাহায্যপুষ্ট সুবিধাভোগী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশ। অনৈক্যকে রক্ষা করিয়া এবং তাহাকে ভাঙ্গাইয়া ইহারা নিজেদের সুবিধা ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ উভয়ই রক্ষা করিতে চায়। কাজেই ঐক্যের ধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। যদি মুক্তি-প্রচেষ্টা কোন সময় কমিয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমানের ক্ষমতাভোগীরাই ইহা ব্যবহারের সুবিধা পাইবেন এবং ঐক্যের ধ্বনির অন্তরালে প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তির ঐক্যকে দৃঢ় করিয়া লইবার সুযোগ পাইবেন। এইভাবে জনগণের বিভেদ ও কলহকে ইঁহারা ঐক্যের নামে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন। অখণ্ড হিন্দুস্থান আন্দোলনও এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে অনৈক্যের গোপন অস্ত্র মাত্র।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পৃথক বৈশিষ্ট্যের অলীকতা

অনেকে বলিবেন এ সকল রাজনীতি ও অর্থনীতির কথা বুঝা গেল বটে, কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির বাহিরের ও তাহার অপেক্ষা উচ্চতর কথাও আছে। রাজনীতি ও অর্থনীতিই মানবজীবনের শেষ-কথা নহে এবং রাজনৈতিক পরাভব ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দৈবের মধ্যেও জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তাহার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বহু দূরাগত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া দুঃখের রজনী সে যাপন করিতে পারে। কিন্তু, একবার যদি সে এই বৈশিষ্ট্যকে হারাইয়া ফেলে, তাহার নিজস্বতা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলেই আসলে তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহার ঐতিহাসিক নজীরেরও অভাব নাই। গ্রীস জয় করিয়াও রোম গ্রীসের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। হিন্দু-ও বৌদ্ধ-সভ্যতা বাহুবলকে অস্বীকার করিয়াও দিগ্বিজয় করিয়াছিল, মুসলিম সংস্কৃতির দীপ্তিতে একদিন ইউরোপ আলোকিত হইয়াছিল, ইত্যাদি। অন্যদিকে বাঁচিয়া থাকিয়াও সভ্যতার ইতিহাসে কত জাতির

মৃত্যু ঘটিয়াছে—আধুনিক গ্রীসের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস সমাধিলাভ করিয়াছে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে কত ক্ষীণপ্রাণ জাতি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। কত প্রাচীন সভ্যতা অবলুপ্ত হইয়াছে, মানব সভ্যতার কত গৌরবময় ধারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! অথচ, হিন্দু ও মুসলমান কত শতাব্দীর কত ঝঞ্ঝা ও বিপদ অতিক্রম করিয়া, কত প্লাবনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কত দুর্যোগ কাটাইয়া আজও টিঁকিয়া আছে। বর্ত্তমানের যে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দুর্দ্দৈব হিন্দু ও মুসলমানকে শত্রুভাবে পিষিয়া মারিতেছে তাহাও আমাদিগকে বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে নাই। এই বৈশিষ্ট্যই জাতির প্রাণশক্তি, তাহার জীবনের উৎস, তাহার জীবন কাঠি। এখান হইতেই নূতন জীবনের সন্ধান লইতে হইবে।

আজ ইহা এতদিনে বিপন্ন হইয়াছে। এতদিন যাহা হিন্দু-মুসলমানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে আজ তাহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সত্যকে পুরাপুরি অস্বীকার করা যায় না; তাই বলা হইল, পাশ্চাত্যের যাহা কিছু ভাব তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে তবে, আমাদের নিজস্ব রঙে রঙীন করিয়া, আমাদের নিজস্ব সভ্যতার ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে তাহাকে খাপ খাওয়াইয়া। কিন্তু, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাধা দিতে দিতে আমরা তাহাকে অনেকখানি গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি। পাশ্চাত্যের উৎপাদনপ্রণালী ও তাহার এদেশে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিক যন্ত্রের প্রয়োজনে আমাদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার গায়ে প্রবল ধাক্কা লাগিয়াছে এবং ইংরাজী সাহিত্যের চিন্তাধারাও আমাদের মনকে সজোরে আঘাত করিয়াছে। এইভাবে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা তাহাকে অনেকখানি বরণ করিয়া লইয়াছি—মুখে যখন বৈশিষ্ট্যের

গুণগান করিয়াছি পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রাকে তখন কোনো মতেই অস্বীকার করিতে পারি নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিরোধী মনোভাবের তীক্ষ্ণতা যখন অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে তখন আবার নূতন সমস্যাকে প্রয়োজনের তাগিদে আমদানি করা হইয়াছে। ইংরেজ ত অনেক, দূরের লোক, ইংরেজি সভ্যতার যতটা ইচ্ছা গ্রহণ এবং যতটা ইচ্ছা বর্জ্জন আমাদের খুসীমত করিতে পারি। কিন্তু, হিন্দু ও মুসলমানকে চিরদিন একই দেশে বাস করিতে হইবে। পূর্ব্বের মত কেহই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে না। কাজেই এখানেই সাবধান হইবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করিয়া রাজনীতিকক্ষেত্রে সম্ভবত এ প্রশ্নটির আমদানি হইত না—যদি সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁহাদের কর্ম্মের পিছনে একটি সূক্ষ্ম আদর্শ প্রতিষ্ঠার তাগিদ বিশেষভাবে অনুভব না করিতেন। কর্ম্মের পিছনে যদি আদর্শের সমর্থন না থাকে, তাহা হইলে বেশী লোককে বেশী দিন তাহার মধ্যে আটকাইয়া রাখা যায় না। বিপদের কথা এই যে, বহু কণ্ঠে বহুবার উচ্চারিত হইয়া সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আজ সত্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং বহু লোকের মনে ইহা আসন করিয়া লইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের কাল্পনিক স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, নিতান্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্যেও পরস্পরের মস্তক চূর্ণ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু ইহাতেও ততটা লজ্জার কারণ ছিলনা—যদি না সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে আদর্শের মহিমা ইহার স্থূল গ্লানিকে ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করিত। আজ আমরা কাল্পনিক স্বার্থরক্ষায় যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিতে যতই উল্লসিত হই না কেন, ইহার কৃত্রিমতা ও নগ্ন বীভৎসতা অল্প দিনেই আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। কিন্তু, বিদ্যার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রে যখন

স্বাতন্ত্র্যের মহিমা কীর্ত্তিত হয় তখন এইজন্যই শঙ্কিত হইতে হয় যে, নিজের ক্ষুদ্রত্বের গ্লানিতে যাহা শীঘ্রই মরিয়া যাইত, তাহা এই ছদ্মবেশী পরোক্ষ সমর্থনের ফলে আরও আয়ুঃ সংগ্রহ করিয়া লইবে। রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক অসন্তোষ সাম্রাজ্যিক নীতির দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রদায়িক নেতাদের উৎসাহে ও ষড়যন্ত্রে আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক কলহে উৎসাহিত করিতেছে আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে আদর্শের সমর্থন ইহার কদর্য্যতাকে ঢাকিয়া দিতেছে।

কিন্তু, যাহাকে আমরা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বলিতেছি, সভ্যতার সংঘাত নামে অভিহিত করিতেছি তাহার আসল রূপটা কি ? পাশ্চাত্য সভ্যতাই-বা কাহাকে বলিতেছি—কেনই-বা সে সভ্যতা বিশ্বগ্রাস করিতেছে—অন্যান্য সভ্যতার উপর জয় হইতেছে ? আমরা যাহাকে হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতা বলি, তাহাদের উভয়ের মধ্যেই মূলগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়েরই সূতিকাগার হইতেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, এইজন্য উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল থাকা স্বাভাবিক—মানবজীবনের মৌলিক আদর্শগুলির মূল্য নির্ণয় উভয় সমাজেই অনেকটা একই প্রকারে হইয়া থাকে। বিবাহ, সমাজ ও পরিবারের গঠন, নৈতিক আদর্শ, সমাজ-পরিবারে নারী ও সন্তানের স্থান—ইহকাল পরকাল ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শাস্ত্রের প্রাধান্য, মানুষের চরিত্রগত গুণাবলী সম্পর্কে সামাজিক মান, জীবিকার উপায় প্রভৃতি জীবনের প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে মূলগত ঐক্য দেখা যাইবে। গরমিল যাহা কিছু সবই খুঁটিনাটিতে, বৈসাদৃশ্য সবই আসিয়া শাখাপল্লবে। তবু আমরা বৈসাদৃশ্যকেই বড় করিয়া দেখি কেন ?

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গতিবিমুখ স্থিতিশীলতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং এই সমাজের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, জীবনের প্রতিদিন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট খুঁটিনাটি, মানুষের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তাহার বিষয়ও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে জীবনযাত্রার প্রতিটি ছোট-খাট ব্যাপার, সামাজিক রীতিনীতির ছোট ছোট ঘুরপ্যাচ মানুষের জীবনে গভীর আধিপত্য বিস্তার করে। মানব সমাজের মঙ্গলের পক্ষে, সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে, মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের পক্ষে, এমন কি সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে লোকে এগুলিকে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করে। নিজেদের এই সমস্ত ব্যাপারের সহিত যাহাদের পরিপূর্ণ মিল নাই, তাহাদিগকে এই সমাজের লোকে অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া ভাবে ও নিজেদের সমস্ত কিছুকে অটুট ভাবে রক্ষা করাকে অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এই ভাবে যখন দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক কোন কারণে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাহাকে আমরা দুইটি সভ্যতার সংঘাত মনে করিয়া থাকি। আসলে ইহা একই প্রকার সভ্যতার বহিরঙ্গের বৈষম্যের দ্বন্দ্ব। একই প্রকার সভ্যতার উৎকর্ষের যে-স্তরভেদ তাহাও বৈষম্যের আকারে দেখা দেয়। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার যে-সংঘাত বৈশিষ্ট্য রক্ষার যে-পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তাহাও এই প্রকারের। উভয়েরই যে-পার্থক্য তাহা মূলগত নহে—অনেকখানি বাহিরের এবং অনেকখানি কৃত্রিম অবস্থাসঞ্জাত।

উভয় সম্প্রদায়ের বাহিরের বৈষম্য দেখিয়া, আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির পার্থক্য দেখিয়া আমরা উভয় সম্প্রদায়ের যতটা মানসিক ব্যব-ধানের কল্পনা করিতেছি, মনে মনে প্রতিযোগিতার ভাব না থাকিলে

এই ব্যবধানকে আমরা ততটা দুরতিক্রম্য কখনই মনে করিতাম না। বিবাহ ও আহারের পদ্ধতি, ভদ্রতার দুই চারিটি নিয়ম এবং এই প্রকার সামান্য জিনিষ সমূহের মধ্যে আমাদের পার্থক্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, একই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় একই প্রকার প্রয়োজন হইতে, মনের একই প্রকার অনুভূতি হইতে, চিন্তার একই প্রকার ক্ষুধা হইতে এসকলের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু, বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে বিভিন্ন ঘটনাবলীর আবর্ত্তনের মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে উভয়ের সভ্যতা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া উভয়েরই বাহিরের রূপে এতটা ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে। আমরা যদি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি লইয়া এসকলের বিচার করিয়া দেখিতে পারিতাম, সহানুভূতি ও প্রীতির চক্ষে পরস্পরকে দেখিতে পারিতাম তবে উভয় (সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতীক) সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সাম্যকে আমরা আরও অনেক বড় করিয়া দেখিতে পাইতাম।

কিন্তু, এ উভয়েরই আয়ুঃ ফুরাইয়াছে অথবা আয়ুঃ ফুরাইবার পরও উভয়কেই কৃত্রিম উপায়ে বাহিরের সাহায্যে বাচাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা যাহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি এবং যাহার কাছে সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার আত্মসমর্পন দেখিতে পাইতেছি আসলে তাহা ধনতান্ত্রিক সভ্যতা। তাহার শ্রেষ্ঠতর শক্তি ও উৎকর্ষের কাছে দুর্ব্বল ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সভ্যতাগুলিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাকে কুক্ষিগত করিয়া ধনতান্ত্রিক সভ্যতা বিজ্ঞানের অস্ত্রে সকলেরই বিচ্ছিন্নতার বাঁধকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এমন বিশ্বজনীন সত্যের শক্তি লইয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মনের উপর সে এমন

অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে যে, পৃথিবীর সমগ্র সভ্যতার ধারাই আসিয়া এই সঙ্গমে মিলিত হইতেছে। আধুনিক কাল একদিকে যেমন বিজ্ঞানের যাদুবলে সময় ও দূরত্বকে কল্পনাতীতরূপে হ্রাস করিয়াছে, তেমনি মানুষের মনের কাছে সে বুদ্ধির, যুক্তির, বিচারের এমন শক্তিশালী দাবী লইয়া আসিয়াছে যে, কোন দেশের মানুষই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।

পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মনই এতদিন অল্পবিস্তর আবদ্ধ ছিল শাস্ত্রের কারাগারে, তাহার জীবনের নির্দ্দেশ আসিত মহাপুরুষের বাণী হইতে, তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইহকাল অপেক্ষা পরকালের দিকে, পারত্রিক কল্যাণের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিত ঐহিক কার্য্যাবলীকে। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের দ্বারে লইয়া আসিল জীবনের বাণী, মুক্তি দিল আমাদের বুদ্ধিকে, সকল জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য হাতে দিল নূতন মাপকাঠি। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন সকল মানুষের বুদ্ধির উদ্বোধন হইল তখন, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এখানে আমরা সকলেই এক। মানুষের শাস্ত্র, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস, তাহার ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু, যুক্তি ও বিচারের মাপ জাতিতে জাতিতে পৃথক হইয়া যায় না, বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রত্যক্ষতা সব মানুষের কাছেই সমান। ইহাই দেশে দেশে মানুষ ও মানুষের মধ্যের ব্যবধানের প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া ভাষা ও পরিচয়ের সীমা পার হইয়া, স্থান ও কালকে অতিক্রম করিয়া বেশভূষা আচার ও রীতিনীতির বৈষম্য ও ভেদ ডিঙ্গাইয়া মানুষকে মিলাইতেছে। তাই আজ দেখিতে পাইতেছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন ভাষার, ধর্ম্মের, বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যের

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের মনের গঠনে, চিন্তার প্রণালীতে, মানব জীবনের ও বস্তুজগতের মল্যনির্দ্ধারণে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ভাষার বাধা যদি না থাকে তবে একজন আধুনিক চীনা একজন আধুনিক তুর্কী, একজন আধুনিক ইয়াঙ্কী একজন ইংরাজ, বা রাশিয়ান একত্র বসিয়া অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে বন্ধু হইয়া উঠিতে পারেন। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিতে হইতেছে যে, একজন আধুনিক ভারতবাসী—একজন আধুনিক বাঙ্গালীও তাঁহাদের পার্শ্বে স্থান পাইতে পারেন। আমরা যদি চক্ষু বুজিয়া বাস্তব জগতের কঠিন তথ্য সমূহ অস্বীকার না করিতে চাই তবে, একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিব। ভারতবর্ষের বা বাংলার হিন্দু-মুসলমানকেও বিশ্বমানবের অংশরূপে গড়িয়া উঠিতে হইবে। যে বৈশিষ্ট্যের প্রাচীর খাড়া করিয়া আমরা পৃথক থাকিতে চাহিতেছি তাহার ভিত্তি মিথ্যা এবং আত্মহত্যাকর। সব দেশের মানুষই আজ চিন্তাধারায় ও মনের গঠনে এক হইয়া যাইতেছে—মন ও চিন্তার দিক দিয়া ইহা মানুষ ও মানুষের মধ্যে, জাতি ও জাতির মধ্যের ব্যবধানকে চূর্ণ করিয়া দিতেছে। আমাদের পক্ষেও বিচ্ছিন্নতা রক্ষাকারী বৈশিষ্ট্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়া মঙ্গলজনক হইবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় ব্যক্তিগত লোভের যে দুর্ব্বল ছিদ্রপথ রহিয়াছে তাহাই বিজ্ঞানের এই শক্তিকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই এই ঐক্যের শক্তি পূর্ণতা লাভ করিবে এবং তাহাই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রকৃত অধিকারী করিবে।

কিন্তু, আমাদের মধ্যবিত্তদের মনে [হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের] এই বৈশিষ্ট্যসূচক মতবাদ এমন গভীর দাগ কাটিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা ইহাকে স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

সকলেরই হাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ঐতিহাসিক নজীর আছে। বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের মমতা বহু বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে এতটা অপার্থিব মূল্যের অধিকারী হইয়াছে যে, শুধু বৈশিষ্ট্যের বিরোধী বলিয়াই আমরা যে-কোন যুক্তিসম্মত, অতিপ্রয়োজনীয় মত কর্ম্মপন্থা বা আদর্শকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিলে বীরত্ব ও দৃঢ়তার গর্ব্বে স্ফীত হই। আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান যায় তাহাই অধিকতর শঙ্কার কারণ হইয়াছে। যদিও বৈশিষ্ট্যবাদ-যে ভিত্তি ও যুক্তিহীন, ইহার মধ্যে-যে গৌরব অপেক্ষা লজ্জার কারণই অধিকতর পরিমাণে নিহিত আছে, ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

যে বৈশিষ্ট্যের নামে আমরা এতটা প্রবল উৎসাহে মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার প্রকৃতরূপ জানিতে হইলে তাহার উৎপত্তির ইতিহাসটাও জানিতে হইবে। একদিন এক দেশের সহিত আর এক দেশের সম্পর্ক ছিল না। একদেশের মানুষ আর একদেশের মানুষকে চিনিত না, তাহার হৃদয়ের বা তাহার বুদ্ধির সন্ধান রাখিত না। তাহার আশা আকাঙ্খা আনন্দের কথা, তাহার দুঃখ বেদনা নৈরাশ্যের কথা জানিত না। পরস্পরের সমস্যা ও সমস্যার সমাধানের সহিত পরস্পরের পরিচয় ছিল না। তাহারা ছিল মহাসমুদ্রে ভাসমান, পরস্পরের সহিত সংযোগহীন, পরিচয়হীন সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের মত। অথচ সব দেশের মানুষকেই প্রকৃতির সহিত যুঝিতে হইয়াছে, খাদ্যের অন্বেষণ করিতে হইয়াছে, শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, সমাজ-জীবনের জটিলতা ও অন্তর্বিরোধের সমাধান করিতে হইয়াছে, কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, বিবাহ সন্তানপালন, পরিবার গঠন

প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে, শৃঙ্খলার কথা ভাবিতে হইয়াছে, সমাজের শত্রুকে বশে আনিতে হইয়াছে এবং জীবনের এমনিতর সহস্রবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, অজানাকে জানিবার জন্য দুর্জ্জেয়কে অধিগত করিবার জন্য মানুষের মনে যে-চিরন্তন প্রেরণা রহিয়াছে, যে-দুর্ব্বার আকাঙ্খা, যে-অপরাজেয় ইচ্ছা আছে—তাহা তাহাকে কত নূতন পথের যাত্রী করিয়াছে, কত দুঃসাধ্য সাধনার, কত মহৎ প্রয়াসে নিযুক্ত করিয়াছে, কত বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছে, কত নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, কত ত্যাগে কত বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কত আত্মসন্ধানে কত দুর্ব্বোধ্যতার গ্রন্থী উন্মোচনে গভীর ধ্যানে ও দীর্ঘ কালব্যাপী তপস্যায় সমাহিত করিয়াছে, কত সত্য সন্ধানের স্পৃহা অন্তরের কত অর্থহীন চাঞ্চল্য, কত ভাষাহীন আহ্বান তাহাকে ভয় শঙ্কুল সুদূরের যাত্রী করিয়াছে ; কত বিস্ময় আনন্দ পুলকের অধিকারী করিয়াছে, তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে কত নূতন জগৎ আবরণ মুক্ত হইয়াছে; কত নূতন সত্য অমলিন দীপ্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে কোনো সংযোগ না থাকায় বিভিন্ন দেশেই সভ্যতার এই অভিযান চলিয়াছে বিভিন্ন পথে, মানুষের কর্ম্মোদ্যম প্রবাহিত হইয়াছে বিভিন্ন খাতে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। বহুকষ্টে বহু সাধনায় বহু তপস্যায় এইরূপে মানুষ যাহা লাভ করিল নিতান্ত স্বভাবতঃই তাহার প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা জন্মিল। সে ভাবিল, আমি যাহা লাভ করিয়াছি তাহা অনন্যসাধারণ ও অনন্য সুলভ, অন্যের তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য দেশেও মানুষ-যে অনুরূপ চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া অনুরূপ ফল লাভ করিতে পারে

যা পারিয়াছে—তাহা কোন এক দেশের মানুষই জানিল না। একটু আধটু জানিবার সুযোগ যদিও বা হইয়াছে তবুও সম্যক পরিচয়ের, পরস্পরের চেষ্টার দ্বারা পরস্পরের লাভবান হইবার সুবিধা কাহারও হয় নাই। বহির্জ্জগৎ হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুদিনব্যাপী চেষ্টার ফলে প্রত্যেক দেশের লোকেরই নিজ নিজ সাধন-পদ্ধতির প্রতি যে দরদ জন্মিল, নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাহা অন্যদের প্রতি চিত্ত বিমুখ করিয়া তুলিল। ইহাই পৃথিবীর সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার পরিচয়। অতীত ইতিহাসে যখন একই প্রকার দুইটি সভ্যতা ঘটনাক্রমে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে তখনই সভ্যতার মিলন না ঘটিয়া সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষেও হিন্দু ও মুসলমানের সান্নিধ্যে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরস্পরের সহিত সংযোগ না থাকায় পূর্ব্বে প্রত্যেক জাতিকেই সভ্যতার উন্মেষের জন্য এক একটি বিশেষ পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল ; যদিও বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই বিভিন্ন পথের মধ্যে মূলগত ভেদ ছিল না। আজ যখন আমরা একত্র সম্মিলিত হইবার ও পরস্পরের সভ্যতাকে দেখিবার ও বিচার করিবার সুযোগ পাইলাম, তখন এই কথাটাই মাত্র আমরা বলিতে পারি অতীত কালে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য ছিল অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্রপথে যাত্রা করিয়াছিলাম। এখনও এই অর্থে আমাদের বৈশিষ্ট্য আছে যে, এখনও আমরা সম্মিলিত হইয়া এক হইয়া যাই নাই, এখনও উভয়েই উভয়ের আবর্জ্জনাটুকু বাদ দিয়া এক সঙ্গে উভয়েই উভয়ের জিনিষগুলি অধিকার করিতে পারি নাই ; কিন্তু, এই যুক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, আমরা আজও এক হইতে পারি নাই বলিয়া, একদিন আমাদের স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করিতে হইয়াছিল

বলিয়া, আমাদের চিরদিন স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে এবং স্বতন্ত্র না থাকিতে পারিলে আমাদের মৃত্যু হইবে। আমরা-যে পূর্ব্বকালে সকলে একসঙ্গে যাত্রা করিতে পারি নাই সেটা বিশেষ কোন দৈব আশীর্ব্বাদের ফলে নহে, মানুষের তদানীন্তন অক্ষমতার ফলে। নিজের ক্ষমতায় মানুষ আজ যখন সেই বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইতে পারিয়াছে, তখনও যদি আমরা এক হইতে না পারি, অন্ততঃ এক হইবার চেষ্টা করিতে না পারি, তবে তাহা আমাদের আদিমতার ও কলহপ্রিয়তারই পরিচায়ক হইবে, লজ্জার কারণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং কখনই গৌরবের বিষয় হইবে না। হিন্দু একদিন একটি বিশেষ যাত্রা-পথে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই বিশেষ পথটাই মাত্র-যে হিন্দুদের পথ হইবে এবং মুসলমানেরা ভিন্নপথে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া-যে সেই পথটাই মাত্র তাঁহাদের অনুসরণীয় হইবে, এমন কথা কখনই সত্য বা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বরং প্রত্যেকেই তাঁহাদের যাত্রাপথে যে সত্যের সন্ধান, সাফল্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাহা সর্ব্ব মানবের এবং তাঁহাদের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু কোনো সত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহা কখনই হিন্দুর নিজস্ব হইয়া থাকিবে না, অথবা মুসলমানের দ্বারা কোন সত্যের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া তাহাও কখনই তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিবে না। সত্যের অনুসন্ধানে ভিন্নপথে চলিতে হইয়াছিল বলিয়া লব্ধ সত্যে সকলের অধিকার থাকিবে না—ইহাপেক্ষা পরিহাসের বিষয় আর কী হইতে পারে।

কথাটা বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করা যাক। ধরিয়া লওয়া যাক, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই বিচ্ছিন্ন থাকা কালীন ভিন্ন ভিন্ন পথে গণিত-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া উভয়েই কতকটা দূর অগ্রসর

হইয়াছিলেন অথচ কেহই কাহারও অগ্রগতির সন্ধান রাখিতেন না। পরে উভয়েরই লব্ধ জিনিষ উভয়ের হাতের কাছে আসিল। বহুদিন পরে আজ উভয়ের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের জন্য আমরা ইহাকে হিন্দু-গণিত ও মুসলমান-গণিত বলিতে পারি এবং তাহার দ্বারা ইহাই বুঝাইতে পারি যে, একটি হিন্দুর দ্বারা এবং অপরটি মুসলমানের দ্বারা অতীতকালে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু, যদি সঙ্গে সঙ্গে বলি যে, হিন্দুর ছেলের পক্ষে হিন্দু-গণিত এবং মুসলমান ছেলের পক্ষে মুসলমান-গণিত শিক্ষা করাই কল্যাণকর এবং উভয়ের পক্ষেই গাণিতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, বিজ্ঞাশাঙ্কর্য্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য অপরের পদ্ধতি হইতে দূরে থাকিয়া নিজ নিজ পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থাকাই শ্রেয়,—তবে তাহা যেমন সকলেরই হাস্যোদ্রেক করিবে, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা সম্পর্কেও আমরা সেই হাস্যকর মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছি।

আসলে সভ্যতা ও সমাজের গঠন, উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল কোনো একটা বিশেষ স্থানে কিছু দিন ধরিয়া যখন একই অবস্থা থাকে তখন সেই অবস্থাকে আমরা সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করি। যখন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার আঘাতে পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগে, তখন সমাজের উপরিভাগেও সেই পরিবর্ত্তন আসিয়া আঘাত করে। সমাজের এই পরিবর্ত্তনকে আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। পুরাতন কাঠামোর মধ্যেই নূতনকে আটকাইতে চাই। এই পুরাতনকে রাখিবার জন্য আমরা বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন ঐতিহ্য প্রভৃতির নাম করিয়া চেঁচামেচি করি। ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের ফিউদাল সভ্যতার সংঘাতে এই অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ফিউদাল সভ্যতার খুঁটিনাটির ভিতর যে সামান্য

দ্বন্দ্ব তাহাকে উৎসাহ দিয়া স্বার্থান্বেষীরা ফিউদাল তন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে এই দুই সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা বিলীন হইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলে যে-বিজ্ঞানের শক্তি রহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে; এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি তখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র জনগণের সম-অধিকারভুক্ত হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

সাহিত্য আমাদের সমগ্র মনের ও প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। ইহা আমাদের মনের ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য্য, যোগ্যতা, শক্তি ও উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করে; আবার আমাদের দৈন্য, শক্তিহীনতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতাকেও বহন করে। কিন্তু, সাহিত্য কতকটা আমাদের পোষাকী মনের রূপ বলিয়া, আমাদের সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির, আমাদের লজ্জা, গ্লানি ও কলঙ্কের সকল দিকের পরিপূর্ণ চিত্র সাহিত্য উদ্‌ঘাটিত করে না এবং সকল বিষয়ের উদ্‌ঘাটন নানা কারণে বাঞ্ছনীয়ও হয় না। আমাদের দোষ ত্রুটির এমন অনেক দিক আছে, যাহা অপ্রকাশ্য-তার অন্তরালে আমাদের অভ্যাসের অজ্ঞতায় লালিত হইয়া আমাদের শক্তিক্ষয় করে এবং যাহার ভয়াবহ অনিষ্টকারিতাকে আমাদের চোখের সম্মুখে খুব স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারিলেই তবে তাহার উচ্ছেদ সম্ভব হয়। এমন সকল দোষকে নির্ম্মম হইয়া নগ্নভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে

পরিবার দায়িত্ব সাহিত্যের আছে। কিন্তু, আবার আমাদের এমন সকল দোষ আছে, চর্চ্চার দ্বারা যাহার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যাহার অনিষ্টকর প্রভাব দূর-ভবিষ্যতের মধ্যে প্রসারিত হইয়া দুর্ব্বলতা ও পঙ্গুত্বকে স্থায়ী করে। কাজেই সমাজের এবং ব্যক্তির ব্যবহারগত চরিত্রের এই সকল অন্ধকার দিক লইয়া কারবার করিবার সময় সাহিত্য যাহাতে নিজেই দুষ্ট না হইয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে সাবধান না হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে এটা সাধারণ কথা, ইহা সব সাহিত্যের পক্ষে সব সময় অল্পবিস্তর সত্য হইতে পারে। কিন্তু, জাতির জীবনে বহু দুর্ব্বলতা এমন সর্ব্বব্যাপীভাবে অনেক সময় দেখা দেয় যে, সেই দুর্ব্বলতাকে লোকে গৌরবের ও মহিমার বস্তু বলিয়া মনে করিতে থাকে; এবং তাই লইয়া অবিশ্রান্ত মাতামাতি ও আস্ফালন চলিতে থাকে। জাতীয় চিত্তের এই বিক্ষোভ হইতে সাহিত্যও রক্ষা পায় না। ভারতবর্ষে-যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বাস আছে, ইহাদের মধ্যে-যে প্রীতি ও ঐক্যের অভাব আছে, ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ বিসংবাদ আছে, রাজ-নীতির কলহ আছে, নানা ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া-যে ইহারা পরস্পরের মস্তক চূর্ণ করিবার কার্য্যে রত হইতে পারেন, ইহাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের বোধ-যে অতিশয় তীক্ষ্ণ—এসকল কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এসকল বিষয় লইয়া-যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইবে, লজ্জাকে লোকে গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করিবে, তর্কের ঝড় ও বাক্যের তুফান বহিবে এবং তাহা-যে সাহিত্যকেও প্লাবিত করিবে ইহা বাঞ্ছনীয় না হইলেও কতকটা স্বাভাবিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ গ্রহণ

করিতে পারি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে বিপুল ঘর্ণাবর্ত্ত দেশকে দুর্গতির অতলে ডুবাইতেছে, তাহার সংহার-মূর্ত্তি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে। নিঃসন্দেহ ইহা বিশেষ শঙ্কার কথা।

আমাদের এই সাম্প্রায়িক বাদানুবাদ-যে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে—তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহা-যে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভাবনাকেও দূরবর্ত্তী করিয়া দিতেছে, তাহাও আমরা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু, শুধু বাদানুবাদেই ইহার শেষ হইতেছে না। আরও গভীরতর প্রদেশে ইহার মূল প্রবেশ করিয়াছে এবং সেইটাই বেশী ভয়ের কথা। যে সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত কারণসমূহের সমবায়ে সাম্প্রদায়িকতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান সাহিত্য তাঁহাদের দ্বারাই সৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা এই ঝগড়াকে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিতে চাহিতেছেন। সাহিত্যের প্রভাব সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও অতিশয় শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। এই প্রভাবকে তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে নিযুক্ত করিতেছেন। প্রত্যক্ষভাবে যেখানে সাহিত্যের মধ্য দিয়া গালিগালাজ চলিতেছে, দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ হইতেছে সেখানে ইহার প্রভাব ততদূর প্রসারী নহে। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় সাহিত্যের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রভাবকে আমদানি করিতেছেন, স্বাতন্ত্র্যকে বড় করিয়া মহিমান্বিত করিয়া দেখাইতেছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তরালে জনসাধারণের মধ্যে যে-গভীর ঐক্যের ধারা প্রবাহিত আছে তাহাকে অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন—বিচ্ছেদকে দীর্ঘতর করিতেছেন---আর তাহারই ফল জাতীয় জীবনে অধিকতর দূরপ্রসারী হইতেছে।

আমাদের সমাজের গঠন সামন্ততান্ত্রিক হইলেও, ইহার প্রান্তভাগ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার আঘাতে আন্দোলিত হইয়াছে। যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, তাঁহাদের চিত্ত ইংরাজী শিক্ষায় পুষ্ট। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চিন্তা ও ভাবধারার উৎসই হইতেছে প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্য। কাজেই, এই সাহিত্যের ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতার উপরেই উঠা উচিত ছিল। ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতার দ্বারা-যে জাতীয় জীবন খণ্ডিত নহে, তাহা ইহা দেখাইতে পারিত। যেখানে আমরা আচার ও ধর্ম্মের প্রাচীরের দ্বারা খণ্ডিত, যেখানে আমরা ছোট ও সাধারণ, যেখানে আমাদের প্রত্যহের দ্বন্দ্ব-কলহ-স্বার্থের বিরোধ, কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে সেখানেই হয় আমাদের পরিচয়। সেখানে আমাদের পার্থক্যের রূপই বড় হইয়া দেখা দেয়, স্বার্থের বিরোধ, উগ্র হইয়া উঠে; আচার ব্যবহার, রীতিনীতি চালচলনে পরস্পরের যে পার্থক্য, তাহাই বড় হইয়া উঠিয়া মানুষকে অন্তরাল করিয়া দেয়, ফলে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ জমিয়া উঠে এবং তাহারই ধূমায়িত অস্পষ্টতায় আমরা পরস্পরের বিকৃত রূপ দেখি।

কিন্তু সাহিত্য আমাদের এই ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে দূর করিয়া দেয়। মনের যে গভীর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি পৌঁছিতে পারে না সেই ঐক্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে আনিয়া সাহিত্য আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে কটুক্তি লজ্জা পায়, যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে হয়, ক্ষুদ্রতাকে আড়াল করিতে হয়—ইহা আমাদের পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করে। ইহাই আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে, আমাদের সকলেরই হৃদয়ে একই দুঃখ এবং আঘাতের বেদনা, একই আশা আকাঙ্খার উন্মাদনা, একই সুখ ও

আনন্দের অনুভূতি রহিয়াছে। বাস্তব জীবনে একের যে সকল প্রথা, পদ্ধতি ও রীতিনীতি অর্থহীন বর্ব্বরতা বলিয়া অপরের কাছে প্রতীয়মান হয় ও তাহার মনে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের সৃষ্টি করে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা তাহার গভীর অর্থ পাই, তাহার আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রকাশের ধারা লক্ষ্য করিতে পারি এবং ইহা আমাদের মন হইতে অশ্রদ্ধার ভাব দূর করিতে পারে। এই সাহিত্য আরও দেখাইয়া দিতে পারিত মানুষের মধ্যের এই ঐক্যের ধারা প্রতিহত হইয়াছে শোষণমূলক ব্যবস্থার দ্বারা। আমাদের সমাজের কাঠামো জীবনের বিকাশের পথকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে এই কাঠামোর যে-বিরোধ তাহাই বহু জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে—ঘরে ঘরে ট্রাজেডীর সৃষ্টি করিতেছে। সাহিত্যই আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে, এইসব আপাত-বিরোধী রীতিনীতি প্রথা-পদ্ধতি উৎসব-আনন্দের পশ্চাতে একটা ঐক্যের ধারা আছে এবং মানব মনের যে সকল অবস্থা হইতে, তাহার যে সব দাবী মিটাইবার তাগিদ হইতে এ সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরস্পরের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক অবস্থার একটা সাদৃশ্য আছে। এ দেশে-যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আছে ও তাহা-যে আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, সেকথাও যেমন সত্য, তেমনই একথাও সত্য যে সাহিত্য আমাদের বিবাদ-বিসংবাদের অবসানকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে। কাজেই এই সম্ভাব্যতা যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় বা বিপন্ন হইয়া না পড়ে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান।—যদিও আত্মহত্যার নেশায় আমরা এতটা

মাতিয়া উঠিয়াছি যে, সে কথাটা স্থিরভাবে বিবেচনা করিবার এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার সম্ভাবনা বেশী লোকের আছে বলিয়া মনে হয় না।

সাম্প্রদায়িকতা আমাদের মনের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে—আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীকে এতটা বিকৃত করিতে পারিয়াছে যে, হিন্দুর কথা ভাবিতে মুসলমানের মনে এবং মুসলমানের কথা ভাবিতে হিন্দুর মনে শুধু প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাবই জাগিয়া উঠে স্বদেশ ও স্বজাতির কথা বলিতে হিন্দু, মুসলমানের অস্তিত্বের কথা মনে করিয়া তৃপ্তি পান না, মুসলমানও স্বজাতি বলিতে কখনই হিন্দুদের কথা ভাবিতে পারেন না। দেশবাসীর এই পরস্পর অবিশ্বাস এতটা দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে, যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মনে দেশের মুক্তি কামনা অন্য যে-কোনো প্রকার ইচ্ছা হইতে প্রবলতর, তাঁহাদেরও অনেকে কোনো-একটি বিশেষ ব্যাপারে, হিন্দু অথবা মুসলমানের মধ্যে কাহার লাভ অধিক হইল, অথবা কে অধিক ঠকিল তাহা লইয়াই মাতিয়া উঠেন। বেশীর ভাগ লোক দেশের ও জাতির কল্যাণকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের হিতের মাপ কাঠিতেই মাপিয়া থাকেন। যখনই ইঁহারা কোনো জিনিষের কথা বলেন বা কোনো অধিকার চাহেন, তখন তাহাতে নিজ নিজ সম্প্রদায় কতটা লাভবান হইবে, বিশেষ ভাবে সেই কথাটাই ভাবিয়া থাকেন। ব্যাপার যখন এইরূপ দাঁড়ায় তখন এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট হইতে বিবেচনা, সংযম, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আশা করিতে পারেন না; একের যাহা শ্রদ্ধার জিনিষ অপরের তাহা বিদ্রূপের ও ঘৃণার জিনিষ হইয়া উঠে; ধর্ম্মের দিক

দিয়া একের নিকট যাহা পালনীয়, অপরের নিকট তাহা বর্জ্জনীয় হয় ; একপক্ষ যাহাকে অবশ্য পালনীয় পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করেন, অপর পক্ষ তাহাকেই ঘোরতর পাপাচরণ বলিয়া মনে করেন। দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বর্ত্তমানে ঠিক এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় ইহাই সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তৃত হইতেছে ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সঙ্কট আসিয়া যখন ঠিক এই সীমায় পৌঁছায়, তখন লোকে বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়ে নিজ নিজ বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য। যে সকল অবস্থা কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করিয়া উভয়কে মিলাইতে পারে, অন্তর্বিরোধের আসল রেখাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারে—সেই অবস্থাকে লোকে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে ; এবং যে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব্বে ব্যবধান ছিল না, সেখানে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য, নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে।

সাম্প্রদায়িকতাকে এইভাবে বাড়ানো, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া, জনসাধারণের মধ্যে নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে ছড়াইয়া দিবার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী দায়ী হইতেছে সংবাদপত্র ও দুই-একটি সাময়িক পত্র। পাঠকেরা যখন চাহেন তখন ব্যবসার খাতিরে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংবাদপত্রগুলি সাম্প্রদায়িক সংবাদকে কিছু পরিমাণে প্রাধান্য না দিয়া পারেন না ; আবার নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে কিছু ওকালতি এবং অপর সম্প্রদায়কে অল্পবিস্তর আক্রমণ না করিলে ইঁহাদের জনপ্রিয়তা বজায় রাখা কষ্টকর হইয়া পড়ে। দুই-একখানি সংবাদপত্র ইচ্ছা করিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। অতিরঞ্জিত করিয়া সংবাদ প্রকাশ করা, অবাঞ্ছিত সংবাদকে

অতিমাত্রায় প্রধান্য দেওয়া, নিজ সম্প্রদায়ের অসহায় অবস্থার কথা নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করা, অপর সম্প্রদায়কে ঝাঁঝাল ভাষায় আক্রমণ করা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে ইঁহারা দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে ছড়াইয়া দিতেছেন। সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা বর্ত্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জনসাধারণের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে। সমাজের ক্ষতি করিবার, ইচ্ছামত জনমতকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা সংবাদপত্রের অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইঁহারা যদি অপেক্ষাকৃত সংযম অবলম্বন করিতে পারিতেন বা নিজেদের মধ্যে কোনো সমিতি গড়িয়া কেহই সাম্প্রদায়িকতার প্রশয় দিবেন না, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন— তাহা হইলেই দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার অনেক কমিয়া যাইত। একমাত্র সংবাদপত্রগুলিই সাম্প্রদায়িকতাকে অনেকখানি আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিতেন। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই হিন্দু মুসলমানের লাভক্ষতির তুলনামূলক হিসাব সম্বলিত যেসব প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহাও পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকেই শাণিত করে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলিই আসলে এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা যদি এবিষয়ে নিরপেক্ষ ও সংযত হইতেন, ইহার পশ্চাতের সরকারী নীতিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেন, পাঠকের রুচি অনুযায়ী না চলিয়া, জনমতের পরিচালক হইতে পারিতেন তাহা হইলে অবস্থা অবশ্যই অন্যপ্রকার হইতে পারিত।

আমাদের স্থায়ী সাহিত্য, রস সাহিত্যকেও অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অভিযান চলিয়াছে। হিন্দুরা বলিবেন, এ ব্যাপারে দায়িত্ব তাঁহাদের নাই—মুসলমানেরাই এ বিষয়ে আক্রমণাত্মক মনোভাব

অবলম্বন করিয়াছেন। একথাটা অনেকটা সত্য হইলেও, হিন্দুরাও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহেন এবং সাহিত্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব নিশ্চয়ই আছে।

ইহার জন্য অবশ্য সাহিত্যিকদের পুরাপুরি দোষী করা যায় না এবং একথাও বলা যায় না যে, তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া বাংলা সাহিত্যকে মুসলমান সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। যে সমাজ-ব্যবস্থা এবং যে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিক কারণের ফলে পাশাপাশি বাস করিয়াও হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন, সেই কারণসমূহকেই এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য দায়ী করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে যে কদর্য্য আকারে সাম্প্রদায়িকতা অন্য সকল সমস্যার পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছে—ইহার পূর্ব্বে হিন্দুরা-যে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন একথা বলা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান-যে পরস্পরের সম্বন্ধে নিরুৎসুক থাকিতে পারিয়াছেন, সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছেন, এতদিন পাশাপাশি থাকিয়াও কেহ কাহাকেও চেনেন নাই, তাহারও কারণ ইঁহারা পরস্পরের প্রতি গভীর অবজ্ঞা পোষণ করিতেন। ইহাও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির স্বরূপ। সচেতনভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় না দিলেও আমাদের কার্য্যাবলীর উপর ইহা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহার প্রতিক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে সক্রিয় করিয়া তুলিতেছে।

হিন্দু সাহিত্যিকেরা ইচ্ছা করিয়া মুসলানদের অবজ্ঞা করিয়াছেন, একথা বলিলে ঠিক হইবে না; তবে, পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের জন্য অনেকটা অজ্ঞাতসারেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কথঞ্চিত নিরুৎসুক থাকিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, মুসলমানদের সম্বন্ধে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ

অবজ্ঞা-যে কোথাও নাই তাহা নহে এবং সর্ব্বত্র-যে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও নহে ; অবশ্য, এইরূপ দৃষ্টান্ত খুবই অল্প ;—[এবং অন্তত বাংলা সাহিত্যের ইহা সাধারণ সুর নহে।] এই অবহেলা হিন্দু সাহিত্যিকদের পক্ষে অন্যায় হইলেও সম্ভবত অমার্জ্জনীয় হইত না। সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমগ্র দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত না হইলে, এবং ইহার বিরুদ্ধে পাল্টা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন উপস্থিত না হইলে, বোধহয় অবস্থা এতটা ঘোরালো হইত না।

হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত দেখিতে চাহেন তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, মুসলমানেরা এপর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত হইয়াছেন। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে, এমন কি শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও শাস্ত্র, ধর্ম্ম, লোকাচার, পৌরাণিক কাহিনী, মহাপুরুষ ও শাস্ত্রকারগণের জীবনী ও বাণী, অতীত ইতিহাসের অনেক গৌরবের কাহিনী প্রভৃতির উপর মনের আকর্ষণ রহিয়াছে। হিন্দু সাহিত্যিকদের মারফতে বাংলা সাহিত্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। হিন্দুরা যখন ইহা পড়েন তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না যে, ইহা হিন্দুভাব ও হিন্দু আদর্শে পরিপূর্ণ। মুসলমানেরা যখন এই সাহিত্য পড়েন তখন পদে পদে যে তাঁহাদিগকে শুধু অপরিচিত ভাবধারার সংস্পর্শে আসিতে হয় তাহা নহে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল ভাব আদর্শ ও মতকে তাঁহারা কিছুটা সন্দেহ ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন পদে পদে তাহারই সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগকে ধাক্কা খাইতে হয়।

অন্য পক্ষে যাহা কিছুকে তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাব-ধারার অঙ্গ বলিয়া জানেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে তাহার সন্ধান অল্পই পান; কাজেই এই সাহিত্যকে তাঁহাদের হিন্দু-সাহিত্য বলিয়া মনে না করিবার কারণ নাই। প্রথমে সম্ভবত অনেকটা এই কারণেই অনেক বাঙ্গালী মুসলমানও বাংলাভাষাকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই। পরে যখন দেখিয়াছেন তাহা সম্ভবযোগ্য নহে, তখন এই সাহিত্য ও ভাষাকে ইস্‌লামীয় রূপ দিবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইহা হিন্দু-সংস্কৃতির ছদ্মবেশী অভিযান;—ইহা মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে গুরুতর শঙ্কার কথা এবং ইহাকে যে-কোনো প্রকারে প্রতিরোধ করিতে হইবে। দেশে সাম্প্রদায়িকতা যে-প্রকার তীব্র তাহাতে এই অবস্থাকে কাজে লাগাইবার লোকের অভাব হইবার কথা নহে এবং তাহা হয়ও নাই। হিন্দুদের দেবদেবীর নামে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ প্রভৃতি এবং তাহার দ্বারা মুসলমানদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-বিচ্যুতির আশঙ্কার কথা বলা হইতেছে এবং ইহা লইয়াই একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনের ধাক্কায় আবার হিন্দুদের মধ্যে সচেতন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইতেছে। তাঁহারা সহস্র কণ্ঠে প্রচার করিতেছেন যে, মুসলমানদিগের দাবী যখন এই প্রকার অসঙ্গত, তাহা যখন সাহিত্য ও ভাষাকেও খণ্ডিত করিতে চাহিতেছে তখন তাহার প্রতিরোধের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহারা-যে এ ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারকারীদের হাতের পুতুল হইয়া কাজ করিতেছেন তাহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। বাংলা দেশের মুসলমানদের-যে বাংলা সাহিত্যের উপর দাবী আছে আর সেই ন্যায়-

সঙ্গত দাবী স্বীকার না করার মূলে-যে সমানই সাম্প্রদায়িক ভাব আছে—সে কথা, যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহেন এবং ইহার জন্য মুসলমানদেরই দায়ী করেন, তাঁহাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আবার মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহেন এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহেন হিন্দু সংস্কৃতি ও আদর্শের আক্রমণ হইতে মুসলিম সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন—তাঁহাদেরও ধীরভাবে অবস্থা বুঝিতে হইবে ; এবং ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা যাহাতে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য-যে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ হইতে এতটা দূরে রহিয়াছে তাহার কারণ সকল প্রদেশের মুসলমানেরাই এতদিন ভাষার মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন, প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সাহিত্যসৃষ্টি করিবার, ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার ভার হিন্দুরাই গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই এই সাহিত্য-যে হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। তবুও বর্ত্তমান সাহিত্য হিন্দুভাব ধারা, হিন্দু আদর্শ, হিন্দু পৌরাণিক নাম ও কাহিনী প্রভৃতির উল্লেখে পরিপূর্ণ হইলেও সমগ্রভাবে ইহা হিন্দু সাহিত্যিকদের সচেতন চেষ্টার ফল নহে। বর্ত্তমান সামাজিক আবহাওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের মনেই এই সকল জিনিষের যে প্রভাব আছে তাহাতে ইহা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাকে তাহার অধিক মনে করিবার কারণ নাই। তবু, মুসলমানদের মনে যে সাম্প্রদায়িক অভিমান আছে, তাহাতে সুকৌশলে আঘাত করিয়া স্বার্থান্বেষীরা তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস জাগাইয়া দিতেছে যে, সাহিত্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারের

হিন্দুসম্পর্কিত কোনো উক্তি থাকিলে, কোনো উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিপোষক যে-কোনো অর্থ কোনো প্রকার ঘোরপ্যাঁচের দ্বারাও আবিষ্কার করিতে পারিলে তাহা মুসলমানদের অপাঠ্য হইবে। সাহিত্যে যে-সকল অংশ হিন্দুদের পৌরানিক কাহিনী প্রভৃতি লইয়া রচিত হইয়াছে, অথবা যেসকল রচনায় পৌরাণিক কাহিনী বা হিন্দুদের দেবদেবী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, অথবা হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিপোষক কোনো উক্তি আছে, তাহাও তাঁহারা বর্জ্জনীয় মনে করিতেছেন। কোনো চরিত্রবিশেষের কোনো প্রাসঙ্গিক উক্তি লইয়াও টানাটানি চলিতেছে।

কোনো কবিতায় বা গদ্যাংশে হিন্দু দেবদেবীর কাহিনী আছে বলিয়া এবং হিন্দু দেবদেবীর কোনো বিশেষ কাহিনী বা গুণ লইয়া কিছু রচিত বলিয়া অথবা মানুষের কোনো গভীর অনুভূতির সহিত বা তাহার সুখদুঃখ বিস্ময়, আনন্দ বা আত্মোৎসর্গের সহিত হিন্দু বা অন্য কাহারও পূজার্চ্চনার কথা বা দেবদেবীর নাম সাহিত্যের কোথাও জড়িত হইয়া আছে বলিয়া তাহাতে-যে মুসলমানদের ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে কিংবা তাঁহারা যে পৌত্তলিক ও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ও অস্বাভাবিক। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে [যদিও একদেশবাসী ও একভাষাভাষী লোকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এই ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক নহে] ধর্ম্মবিশ্বাসের অনৈক্য আছে, কিন্তু মানুষের এই পার্থক্য মনের উপরি ভাগের ; প্রত্যেকের গভীর অন্তরে সকল মানুষই এক। উপরের শত পার্থক্য সত্ত্বেও এই অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে সংযোগ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। এই জন্যই সামাজিক রীতিনীতি,

আচার ব্যবহার, ভাষা, বিশ্বাস, মনের গঠন প্রভৃতির দূরতিক্রম্য ব্যবধান সত্ত্বেও যে-কোনো দেশের এবং যে-কোনো কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সকল দেশের সকল মানুষের কাছেই চিরকালই মূল্য পায়।

ইংরাজী ভাল কবিতা বা গল্প-উপন্যাস পড়িবার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকেরই আছে। সে-যে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার সাহিত্য—সে ভাষার, সে সাহিত্যের সহিত-যে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বা সংযোগ নাই—ভাল বই পড়িবার সময় সে কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। দেশ, কাল ও পরিবেষ্টনীর প্রভাব সত্ত্বেও মানুষের গভীর চিত্তদেশে-যে সব মানুষই মূলত এক—ভাল সাহিত্য আমাদের কাছে তাহাই উদ্‌ঘাটিত করে।

সব ভাল সাহিত্য যদিও পরিবেষ্টনীর সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, লোকের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির ঊর্দ্ধে যদিও ইহার লক্ষ্য, তবুও এই সকল ক্ষুদ্র জিনিষকেই আশ্রয় করিয়া তাহা গড়িয়া উঠে; ইহাই তাহার একমাত্র এবং প্রধান অবলম্বন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের মধ্যে বহুবিধ ভিন্নতা বিদ্যমান আছে বলিয়া সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয়ের মধ্যে ও তাহার প্রকাশ ভঙ্গীতে অন্যান্য খুঁটিনাটি সমূহের মধ্যেও এই পার্থক্য থাকিয়া যায়। কিন্তু এই আপাত-পার্থক্যের অন্তরালে যে-গভীর ও শক্তিশালী ঐক্যের-ধারা আজও মানুষকে সর্ব্বোপরি মানুষ রাখিয়াছে তাহাই সাহিত্যের লক্ষ্য বলিয়া তাহার শক্তি ও প্রভাব সাহিত্যের বহিরাবরণকে অতিক্রম করিয়া যায়। যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে মানুষের মনের কাছে তাহার মূল্য বেশী নহে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আশ্রয় ও উপলক্ষ্য যে বিষয়বস্তু, মনের উপর তাহার প্রভাব নিতান্তই তুচ্ছ। এইজন্য

পরধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ যতই থাকুক, পরধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভাল সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোথাও বিদ্বেষ দেখা যায় না। কোনো দেশে কোনো সময়ই মানুষের মন সমগ্র অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা জাতীয়তার উপর জোর দিয়া অতীতের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে অনেকখানি ফিরাইয়া দিয়াছে। তদুপরি আমাদের মানসিক সংযোগ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সহিত হইলেও এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দেশে অতীতের সহিত সংযোগ অনেক বেশী নিবিড়। বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকদের পক্ষেও একথা সত্য।

হিন্দুদের অতীত সভ্যতার অনেকখানি, তাহাদের সকল মহৎ কল্পনাই নানা দেবদেবীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট, কোন স্থানে ইহারা বিশেষ কোন গুণের প্রতীক, কোথাও ইহারা আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক, কোথাও-বা ইহারা কাহিনীর নায়ক নায়িকা। ইহার মূলে পৌত্তলিকতার কল্পনা থাকিলেও বহুদিনের অভ্যাসের ফলে [সেই অভ্যাস কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়াই গঠিত হইয়াছে] আমাদের মনের কাছে এই সকল দেবদেবীর নাম কোন-না-কোন গুণ, শক্তি বা ক্ষমতার বিশেষ অর্থপূর্ণ নামই হইয়া দাড়াইয়াছে। কোন নাম হয়ত কোন কাহিনীর সহিত এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, সেই কাহিনীর উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব সেই নামের দ্বারাই সূচিত হইয়া আসিতেছে। কত বীরত্ব, কত মহত্ব, কত ত্যাগ কত স্বেচ্ছাকৃত দুঃখ, কত শোকাবহ কারুণ্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কত অভ্যুত্থান, সত্যের জন্য কত প্রাণদান, কত কৃচ্ছ্রসাধন, কত তপস্যা সাধনা, সংযম, কত স্নেহ প্রেম ভক্তির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া কত নাম অমর হইয়া আছে। কত নাম হিংসা

ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের প্রতীক হইয়া আছে। বর্ত্তমানের লেখকেরা দেবদেবীদের প্রতি ভক্তি বশতঃ অথবা দেব-দেবীর উপর অন্যলোকদের ভক্তি বাড়াইবার দুরভিসন্ধিবশতঃ ঐ সকল নাম ব্যবহার করেন না। মুসলমান লেখকেরাও এই জন্য সমান আগ্রহের সহিতই এই সকল নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের যেসকল বিষয় সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোনো ভাল সাহিত্যই সে সকল আপত্তির কারণ হইতে মুক্ত নহে। আমাদের সকলকেই বর্ত্তমানে ইংরাজী পড়িতে হইতেছে, এই সাহিত্যে উক্ত প্রকারের আপত্তির কারণ কিছুমাত্র কম নাই। তাই বলিয়া ইংরাজী সাহিত্য কাহারও পরিত্যজ্য হয় নাই। তাহার কারণ আপত্তির আসল লক্ষ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু নহে। আমাদের নিজেদের সাহিত্য সম্পর্কে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহার কারণ সাহিত্যকে এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সকল কথা ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই সাহিত্য সম্পর্কে আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে বলিয়া অধিবাসীরা সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত আছেন ও তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনুভূতি রহিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির খেলা জাতীয় জীবনের সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে। সাহিত্যের যে-সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব—ইহাও তাহারই প্রতিফলন। আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোর করিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে একথা সত্য। কিন্তু, সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহাকে আজ আর নিরুপদ্রবে রক্ষা করা যাইতেছে না।

যান্ত্রিক সভ্যতার আঘাত আসিয়া নিত্যই ইহার গায়ে লাগিতেছে, স্বদেশী ও বিদেশী মূলধনে কারখানা-শিল্প অল্পকিছু পাশাপাশিই গড়িয়া উঠিতেছে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাজার লইয়া প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়াছে ও তাহার জন্য বিভিন্ন শিল্পসমৃদ্ধ জাতির সংস্পর্শে আমাদিগকে নিত্যই আসিতে হইতেছে, সর্ব্বোপরি যুদ্ধ মাঝে মাঝে সবই উলট পালট করিয়া দিতেছে ও স্থিতিশীল সমাজকে গতিশীল হইতে বাধ্য করিতেছে।

দেশে যে সকল রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আন্দোলন হইতেছে তাহাও প্রতিদিন এই ব্যবস্থাকে ক্ষয়ের পথে লইয়া যাইতেছে—অধিবাসীদের মনে ও অভ্যাসে পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিতেছে—লোকের বুদ্ধি ও কল্পনা নাড়া পাইতেছে। নূতন অর্থনীতিক ও রাজনীতিক আদর্শ লোককে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, লোকে নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব-ধারার সন্ধান পাইতেছে, বিদেশী সাহিত্যের নবতম চিন্তা ও ভাব-ধারার সহিত পরিচয় ঘটিতেছে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গী ও স্থিতিশীল মনকে লোকে ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। কাজেই একথা আশা করা অন্যায় হইবে না যে, আমাদের সাহিত্যও তাহার পুরাতন ধারা ও কাঠামোকে অনেকখানি ঝাড়িয়া ফেলিবে—নূতন ভাবে ও নূতন রূপে তাহার বিকাশ নূতন পথেই ঘটিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

ভাষা ও সাম্প্রদায়িকতা

সাহিত্যের সহিত ভাষার প্রশ্নটাও কতকটা একই সঙ্গে জড়িত। কারণ সাহিত্যে যেমন চিন্তা ও ভাবধারার প্রকাশ, ভাষা তেমনি সংস্কৃতি ও ভাবধারার বাহন। কাজেই, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ভাষার ঝগড়াও আসিয়া পড়িয়াছে। সারা ভারতবর্ষে যখন ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইল এবং তাহার আশ্রয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল তখন মুসলমানেরা যেমন ইংরাজী শিক্ষা হইতেও সরিয়া রহিলেন তেমনই প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যকেও নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা উর্দুকেই মাতৃভাষার আসন দিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার ব্যাপারে উর্দুই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিল। এই সময়ই সব প্রদেশের হিন্দুরা নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ ও কার্যোপযোগী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজেই সব প্রদেশেই দ্বন্দ্ব থাকিয়া গেল প্রাদেশিক ভাষা ও উর্দুর মধ্যে। ভারতের সাধারণ

ও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীকে চালাইবার প্রস্তাবের পর হইতে ইহা কতকটা হিন্দী ও উর্দুর প্রতিযোগিতায় পরিণত হইয়াছে। এই দুয়ের সামঞ্জস্যের চেষ্টায় হিন্দুস্থানীর আবির্ভাব।

তাহা হইলেও প্রাদেশিক ভাষার ক্ষেত্রে অল্প পরিবর্ত্তিত আকারে এই বিরোধের তীব্রতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, আর এই সকল ভাষার সহিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক আছে বলিয়া এখানে ইহা কতকটা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও এই বিরোধ আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বাংলাভাষায় সাহিত্যের প্রধান অংশ হিন্দু-সাহিত্যিকদের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে—মুসলমানগণ যেমন প্রাদেশিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসেন নাই তেমনই হিন্দু-সাহিত্যিকগণ মুসলমান অধিবাসীদের কথা প্রায় ভুলিয়াই ছিলেন। একদিকে ইহাতে হিন্দু-ভাবধারা ও আদর্শের দ্বারা সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছে, অন্যদিকে ইহার শব্দ-সম্ভার সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে বাংলাভাষার উৎপত্তি বলিয়া সেদিক দিয়াও এই চেষ্টা কতকটা স্বাভাবিক হইয়াছে। এই ভাবে ইহার প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হইলেও স্বাভাবিক পরিণতি ইহাকে অন্যদিকে লইয়া চলিয়াছে। সাহিত্য যতই প্রসারলাভ করিয়া জনসাধারণের বস্তু হইয়া উঠিতে লাগিল সাহিত্যের ভাষা ততই কথ্যভাষার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে দেশী চলতি শব্দ গৃহীত হইতে লাগিল। এইভাবে আধুনিক ভাষা সংস্কৃত প্রভাব হইতে প্রায় মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। [সংস্কৃত হইতেই-যে ইহার কাঠামোর উদ্ভব সে কথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য]

বাংলাভাষা যে কথ্যভাষার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ইহার মধ্যেও একটু কথা আছে। বাংলা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা হইলেও এবং

উভয়ের কথ্যভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলেও, কোন কোন বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় কর্তৃক ব্যবহৃত কথ্যভাষায় ও লেখ্যভাষায় ব্যবহৃত আরবী ও পার্শী শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহা হইলেও, ধর্ম্মসম্পর্কিত, আত্মীয়তার পরিচায়ক ও সৌজন্য-সূচক অনেক ইসলামীয় শব্দ মুসলমানেরা নিত্য ব্যবহার করেন অথচ এই সব শব্দ হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব নিকট নহে বলিয়া এই সকল শব্দ হিন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। আবার ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কিত নানা বিষয়ের সহিত এই সব শব্দের সংশ্রব বেশী বলিয়া এগুলির প্রতি মুসলমানদেরও মনের টান থাকা স্বাভাবিক। কাজেই এই ব্যাপারটি লইয়া ভাষার ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

মুসলমানেরা দেখিলেন, তাঁহাদের নিত্যব্যবহার্য্য এবং তাঁহাদের মতে ইস্‌লামীয় ভাব ও আদর্শের সহিত সম্পর্কিত অনেক শব্দ সাহিত্যিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় না; তাহার পরিবর্ত্তে এই সকল অর্থবোধক অন্য শব্দ তাঁহাদিগকে ব্যবহার করিতে হয়। সেই সকল শব্দ আবার হিন্দুদের পারিবারিক সামাজিক ও ধর্ম্মসম্পর্কিত শব্দ বলিয়া তাঁহাদের মনে সেগুলির সম্পর্কে হয়ত খুব শ্রদ্ধার ভাবও নাই এবং কথিত শব্দ সমূহের ভিন্নতার দ্বারা হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের পার্থক্য রক্ষিত হয় বলিয়া তাঁহাদের অনেকে বিশ্বাসও করেন। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে এই সকল কথার প্রচলনের দ্বারা-যে ধীরে ধীরে মুসলমানদের হিন্দুভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে, এই বলিয়া

আন্দোলন সৃষ্টি করা কঠিন কথা নহে এবং তাহা করাও হইতেছে। বাংলার মুসলমানদের জীবনযাত্রার সহিত কোনো সম্পর্ক নাই, এমন অপ্রচলিত আরবী ও ফার্শী শব্দ বাংলায় এমনকি পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতিতে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ইহা উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রচুর ইন্ধন যোগাইতেছে। যাঁহারা ইহা করিতেছেন, তাঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক ভাষার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়া, নিজেরাই তাহা পরিতৃপ্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপারে সম্প্রদায়ের মনোভাবকে বিপথে চালিত করিবার সুবিধা ইহারা নিজেরাই রাখিয়াছেন।

অন্য দিকে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার উপরও ইহার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা হিন্দু-জনসাধারণকে এই বলিয়া সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণে হিন্দুরা—বিশেষ করিয়া বাংলার হিন্দুরা সব দিক দিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেই এই আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষায় উর্দু ফার্শী শব্দ চালাইবার চেষ্টাকে ইহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ ধরা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মনে বিশেষ মমতা বোধ আছে। তাঁহাদের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জীবনে মাত্র এখানেই তাঁহাদের সৃজনীপ্রতিভার বিকাশের সামান্য ক্ষেত্র ছিল। তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের ফাঁকে এখান হইতেই সামান্য-কিছু সম্মান তাঁহারা বিশ্ববাসীর নিকট হইতে আহরণ করিয়াছেন। বিশ্বচিত্তের সহিত সংযোগের এই ক্ষীণসূত্রটা তাঁহাদের গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববাসীর নিকট হইতে ইহাকে তাঁহারা হিন্দু-মনীষার স্বীকৃতি হিসাবেই গ্রহণ

করিয়াছেন। কাজেই, অপরিসীম আগ্রহ ও মমতার সহিত হিন্দুর ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। ইহার উপর সামান্য আঘাত তাঁহার সহিতে পারেন না—ইহার কিছুমাত্র রূপান্তর তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। এমনকি কাহারও ন্যায্য দাবীতেও কর্ণপাত করিতে তাঁহারা রাজী নহেন ; তাহা না হইলে বাংলা সাহিত্য ও ভাষায়-যে বাংলার মুসলমানেরা এতদিন উপেক্ষিত হইয়াছেন, একথাটা সহজে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন।

এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের উপর হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দাবী আছে। বাংলা ভাষায় যাঁহারা কথা বলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। নানা কারণে উভয় সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারে, কথাবার্তায় ও সামাজিক পরিবেশে কিছু কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। ভাষায় ও সাহিত্যে ইহার কিছু ছাপ পড়িবেই। অর্দ্ধেকের উপর বাঙালী নিত্য যেসব শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, ভাষায় তাহা স্থান পাইবে না—ইহাপেক্ষা অসঙ্গত কথা আর কী হইতে পারে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভাষার ক্ষেত্রে মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক অভিযানের কথা হিন্দুরা প্রমাণ করিতেছেন—আসলে তাহাতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই প্রকাশ পাইতেছে। বাংলা ভাষায় আরবী ফার্শী শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে একটা সাধারণ আলোচনা ও পরিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও ইহার মধ্য দিয়াই প্রচারিত হইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার অবসান চাহেন ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবিলম্বে মুসলমানদের ন্যায় সঙ্গত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে

ন্যায্যদাবী প্রত্যাখ্যানের সূত্র বাহিয়াই অন্য পক্ষের সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রসারের পথ করিয়া লইতেছে। ইহার প্রতিরোধের জন্য মুসলমানদের মধ্যে কোন্ কোন্ নূতন কথা সাধারণত ব্যবহার হয় এবং তাহার মধ্যে কোনগুলির প্রচলন সর্ব্ব-বঙ্গব্যাপী তাহার অনুসন্ধান এবং সাহিত্যে তাহার স্থানদান আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে হিন্দুদের বা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনো ক্ষতির কারণ নাই। কারণ সাহিত্যের ভাষার সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক ও সংযোগ যত নিকট হইবে ভাষা ততই প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী হইবে। নূতন দানে তাহার ক্ষতি না হইয়া সমৃদ্ধিই বাড়িবে।

অন্যদিকে মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদেরও মনে রাখা উচিত যে, একদিন উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ফার্শীর বিশেষ প্রচলন ছিল—তৎকালীন বাংলা ভাষার মধ্যেও ফার্শী শব্দ বহুল পরিমাণে ঢুকিয়া গিয়াছিল। সেই সময় আদালতে, জমিদারী সেরেস্তায় ও দলিল পত্রাদিতে যে বৈদেশিক শব্দবহুল ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার কতকটা জের আজও চলিয়া আসিতেছে। এই সকল শব্দের অনেকগুলি বাংলা ভাষার এবং উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালীর কথ্য ভাষার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। তবুও ঐ দিনের ফার্শীবহুল বাংলা ভাষা টিকিতে পারে নাই। মুসলমানী বাংলা সৃষ্টির চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভ কালে যে সংস্কৃতবহুল ভাষা প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সে চেষ্টাও বিফল হইয়াছে; সংস্কৃতানুরাগীরা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, জনসাধারণের দ্বারা নিত্য ব্যবহৃত ভাষা হইতে যাহার পার্থক্য অনেক বেশী তাহা মাত্র শিক্ষিত লোকদের চেষ্টায়

বাঁচিয়া থাকে না। আজ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌখিক ভাষায় অজস্র ইংরাজী শব্দের ব্যবহার হয়। সাহিত্যের ভাষাতেও যদি সে-গুলিকে রক্ষা করিয়া নূতন ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা হইত, তাহা হইলেও সে কৃত্রিম চেষ্টা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিত না—জনসাধারণ তাহাকে ঝাড়িয়াই ফেলিত।

যদি এদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে বৈদেশিক উপাদান বেশী থাকিত অথবা কোনো প্রকার অবস্থার আবেষ্টনে তাঁহারা আরও অনেক বেশী আরবী ফার্শী শব্দকে নিজেদের মাতৃভাষার অঙ্গ করিয়া লইতে পারিতেন তাহা হইলে দুইটি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারিত। হয় ইঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে এই সব শব্দের প্রচলন হইত এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষার সাধারণ রূপের কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটিত। অথবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের উর্দুর ন্যায় এখানে বাংলা ভাষার একটা মুসলমানী রূপ গড়িয়া উঠিত এবং তাহার একটা স্বাভাবিক ভিত্তিও থাকিত। যাঁহারা ভাষাকে কৃত্রিম করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তদের সম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিতেছেন তাঁহারা আসলে নিজ সম্প্রদায়ের কোনো হিতসাধন করিতেছেন না বরং শিক্ষার বাহন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন ভাষাকে কৃত্রিম করিয়া তাঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মনের সহজ বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। এই আঘাত হিন্দু-সাধারণের গায়ে যতটা মুসলমান-সাধারণের গায়েও ততটা লাগিবে—হয়ত বা বেশীই লাগিবে।

সাহিত্যিকদের লক্ষ্য হইবে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদি যাহাতে বহুলোকের সমাদর লাভ করে এবং ভবিষ্যতে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা সমাদৃত হয়। কাজেই, সাম্প্রদায়িক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

হয়ত তাঁহারা দুই-চারিটি রচনা মিশ্রভাষায় করিতে পারেন কিন্তু, তাঁহাদের অধিকাংশ রচনা—ভাল রচনা—প্রচলিত ভাষাতেই লিখিত হইবে। প্রচলিত ভাষায় লিখিত না হইলে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের মধ্যে অধিক দিন ধরিয়া এই সকল রচনার সমাদর পাইবার আশা কম।

সংস্কৃত ও আরবী ফার্শী শব্দের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু বাংলা প্রদেশের নহে, সারা ভারতবর্ষেরই সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দী ও উর্দুর যে-বিরোধ তাহাও এই বিরোধেরই পরিণতি। হিন্দী ও উর্দুর বিরোধ মিটাইবার জন্য হিন্দুস্থানীর কল্পনা করা হইল, দুই রকম বর্ণমালা ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হইল। কিন্তু, তাহাতেও বিরোধের অবসান ঘটে নাই। হিন্দুরা বলিতেছেন হিন্দুস্থানীর নামে উর্দুকেই চালানো হইতেছে এবং মুসলমানেরা বলিতেছেন ইহা উর্দুর বিরুদ্ধে হিন্দীর ছদ্মবেশী অভিযান। সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারের দ্বারা লাভবান হইবার প্রবল তৃতীয়পক্ষ যেখানে রহিয়াছে এবং তাহাদের অনুগ্রহপুষ্ট কয়েকজনের তাহাতে কিছু কিছু সুবিধা হইবার আশা রহিয়াছে, সেখানে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই-যে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনের সন্ধান করা হইবে এবং জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তপথে চালানো হইবে—তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কী আছে!

সপ্তদশ অধ্যায়

সমাধানের ইঙ্গিত

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলির আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা অসার। ইহার পশ্চাতে দলবিশেষের স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণা রহিয়াছে। জনসাধারণকে মিথ্যা যুক্তির দ্বারা ভুলাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লওয়াই ইহার লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কোনো সম্প্রদায়ের জনসাধারণই লাভবান হইবে না এবং একমাত্র ইহার অবসানের মধ্যেই তাহাদের কল্যাণ নিহিত আছে। অথচ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব রহিয়াছে, এবং নানা ক্ষেত্র হইতে উস্কানির ফলে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক চেতনা খুবই তীক্ষ্ণ হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে জনসাধারণের অনেক ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে এবং এই সকল দাবী সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়ায় সংখ্যালঘিষ্ট জাতিগুলির

অতি স্বাভাবিক ভয় ও অবিশ্বাস সাম্প্রদায়িকতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য খুব ধীর ও সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সমগ্র প্রশ্নটির যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহার মধ্যেই অবশ্য সমাধানের ইঙ্গিত নিহিত আছে। যাহাকে মূলগত কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যে সকল অবস্থার আনুকূল্যে এই মূলগত কারণ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, সেই মূল কারণ ও তাহার বর্দ্ধনোপযোগী পারিপার্শ্বিকের অবসান ঘটাইতে পারিলেই এই অবাঞ্ছিত ও জটিল অবস্থা দূর হইবে। কিন্তু, সেই মূলগত কারণ ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন কী উপায়ে করা যাইবে। যে কারণ ও যে অবস্থার কথাই বিবেচনা করা যাক, দেখা যাইবে, তাহাও পশ্চাতে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশল। সাম্প্রদায়িক বিভেদের আশ্রয়েই সাম্রাজ্যবাদ এখানে আত্মরক্ষা করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদকে অপসারিত করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়স্থলগুলিকে চূর্ণ করা যাইবে না। আবার সাম্রাজ্যবাদকে অপসারিত করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষার প্রধান দুর্গ সাম্প্রদায়িক বিভেদকে-যে প্রথমেই দূর করিতে হইবে। এবিষয়ে ভারতের মুক্তিকামীদের অবহিত থাকা প্রধানতম কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে সাম্প্রদায়িক বিভেদ-যে সবচেয়ে বড় বাধা একথা কংগ্রেস অনেক আগেই বুঝিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িকতার সমাধানের জন্য কংগ্রেসের প্রচেষ্টা বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসই সর্ব্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান; এবং জাতীয়তাকে সাম্প্রদায়িকতার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। কিন্তু অকপট ইচ্ছা এবং নানা উপায়ে চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস মুসলিম-জনসাধারণের উপর যে তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, এ কথা সত্য। ইহার কারণ

কী? ইহার নিশ্চয়ই বহুতর জটিল কারণ বিদ্যমান আছে। ইহার সকলগুলির আলোচনা এখানে সম্ভব না হইলেও কয়েকটির আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম কথা, জাতীয়তার বিকাশ শিল্পের বিকাশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পূর্ব্ব বর্ণনানুযায়ী দেশের যাহা কিছু ধনসম্পদ প্রধানত হিন্দুদের হাতেই ছিল। ফলে, এদেশে ধনিক সভ্যতার যতটুকু বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহার সহিত হিন্দুদের (আরও সঠিকভাবে অ-মুসলমানদের) সম্পর্ক তুলনায় অনেক বেশী। জাতীয় আন্দোলনের আওতায় এই সমাজভুক্ত লোকদেরই আসা স্বাভাবিক। আবার অন্যদিকে মুসলমানেরা প্রায় সমগ্রভাবে কৃষক অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক আওতায় থাকিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই, জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা তাঁহারা অনেক কম প্রভাবিত হইয়াছেন। জাতীয় সংগ্রামের সহিত যদি অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম যুক্ত হইত তাহা হইলেই ফল অবশ্য অন্যপ্রকার হইতে পারিত। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আন্দোলনে প্রধানত হিন্দুরা থাকায়, এবং ইহার সহিত প্রথম দিকে বড়লোক ও জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা থাকায় কৃষকপ্রধান মুসলমান সমাজ ইহাকে বরাবরই ঈষৎ সন্দেহ করিয়াছেন। অন্ততঃ তাঁহাদের মনে সন্দেহ জাগ্রত করা সহজ হইয়াছে।

মুসলমানদের সন্দিগ্ধ হইবার আরও কারণ আছে। মোগল শাসনের শেষভাগে শিখ ও মারাঠা, বিশেষ করিয়া মারাঠাদিগের অভ্যুত্থান জাতীয় অভ্যুত্থানের গৌরব লাভ করে। তৎকালে এবং তাহার পরবর্ত্তী কালেও সারা ভারতবর্ষের হিন্দুরা ইহাকে একই সঙ্গে জাতীয় ও হিন্দুগৌরবের প্রতীক বলিয়া মনে করিয়াছেন। এখনও অনেকে ইহার এই ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন। বহু দিন পর্য্যন্ত হিন্দুরা জাতীয় গৌরব বলিতে

হিন্দু-গৌরব ও হিন্দু প্রাধান্য বুঝিয়াছেন। আমাদের দেশপ্রীতিমূলক সাহিত্যের মধ্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অনেক দিন ধরিয়া এদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহার ফলে, হিন্দুপ্রাধান্যের ইচ্ছার পশ্চাদভূমি হইয়াছে—মুসলমানের উপর প্রাধান্য। (যদিও, অধিকাংশ স্থলে এই ইচ্ছা সচেতন নহে।) জাতীয় আন্দোলনের স্রোতোধারা এই প্রকার সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হয় নাই। ইহা হইতেছে সাধারণ লোকের ধারণা ও তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে মুসলমানদের ইতিহাস-আগত এই সন্দেহ, জাতীয় আন্দোলনের পূর্ব্বোক্ত খুটিনাটি হইতেই সুদৃঢ় হইবার মতো মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে অতিক্রম করিয়াই জাতীয় জীবনের আরম্ভ। তবুও আমাদের দেশে সমাজের মূল (সমাজের যে-অংশ সামন্ততন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে সে অংশেরও) সামন্ত-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। জাতীয় আন্দোলন যখন আরম্ভ হইল, দেশের মাতৃমুর্ত্তি কল্পনা করা হইল। ইহা হিন্দু মনোভাব প্রসূত এবং মুসলমান বিশ্বাসের পরিপন্থী। দশভূজা দেশমাতৃকার কল্পনা, বন্দেমাতরম জাতীয় সঙ্গীত, রাখীবন্ধন এবং রাজনীতিক অনুষ্ঠান, সভা সমিতি প্রভৃতিতে মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের কাল্পনিক রূপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মবিশ্বাস ও হিন্দুর সামাজিক আচরণের ছাপ ছিল। ইহার পশ্চাতে অবশ্য সচেতন সাম্প্রদায়িক আকাঙ্খা অথবা মুসলমানদের উপর কোনো প্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। (যদিও তিলকপ্রমুখ নেতাগণ হিন্দু-সংস্কৃতির আন্দোলনের পথে স্পষ্টতই জাতীয় আন্দোলনকে চালাইতে চাহিয়াছিলেন।)। যাঁহারা জাতীয় আন্দোলন চালাইতেছিলেন

তাঁহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের (প্রাকশিল্প) লোক ছিলেন বলিয়া এই সমাজের প্রভাব আন্দোলনের মধ্যে অনুভূত হইয়াছে। মুসলমান সমাজের উপরও ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। এই সংঘাত তাঁহাদের মধ্যেও নূতন চেতনা ও নব জাগরণ আনিয়াছে এবং নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তাঁহাদের প্রয়াসী করিয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে জাতীয় আন্দোলনের উপর মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব অপরিসীম। তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন যদিও সর্ব্বাংশে জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিয়াছিল তবুও তাঁহার নিজের প্রেরণার মূলে ছিল ধর্ম্ম ও নীতি। মহাত্মাজীর ধর্ম্ম ও নীতির সারভাগ বিশ্বজনীন হইলেও ইহার বহুলাংশের উপর হিন্দুদর্শন, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুর সামাজিক বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ছাঁচে ঢালাই করিতে চাহিয়াছেন এবং অনেকাংশে করিয়াছেনও তাহাই। তিনি তাঁহার অসংখ্য লেখা, বক্তৃতা ও বিবৃতির মধ্য দিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে একথা কোথাও গোপন করেন নাই যে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি ধর্ম্ম ও নৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসাবেই পরিচালিত করিতে চাহেন।

১৯২০-২২ সনের অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশ যখন উদ্বেলিত তখন মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "আমি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলিয়া মনে করি। কারণ, বেদোপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র এবং অবতার ও পুনর্জন্মেও আমার বিশ্বাস আছে। আমার মতানুসারে সম্পূর্ণ বৈদিক অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আমি বিশ্বাস করি। প্রচলিত অর্থ হইতে আরও ব্যাপক অর্থে আমি গো-রক্ষণ নীতিতে বিশ্বাস করি। আমি মূর্ত্তি পূজায় অবিশ্বাস করি না।"

যে সকল কর্ম্মী অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন তাঁহাদেরও অধিকাংশ লোক মহাত্মাজীর ধর্ম্ম ও নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হন—রাজনীতিক লক্ষ্যকে ইহারা অনেকেই দ্বিতীয় স্থান দেন এবং ধর্ম্মের অংশ হিসাবেই গ্রহণ করেন। স্তোত্রপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া, কংগ্রেস-কর্ম্মীদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে চরিত্র গঠনের বিভিন্ন দিকে যেভাবে জোর দেওয়া হইতে থাকে তাহাতে কংগ্রেস কার্য্যালয়গুলি অনুষ্ঠানের দিক দিয়া প্রায় আশ্রমে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা-যে মুসলমানদের মনে ভীতি উৎপাদন করিবে—অন্তত যাহারা মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহে তাহারা-যে ইহাকে কাজে লাগাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কী আছে। 'রামরাজত্ব' শিক্ষা-পরিকল্পনা, হিন্দী প্রচার (গোড়ার দিকে) প্রভৃতি সবই জাতীয় আন্দোলনের উপর হিন্দুপ্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয়।

কিন্তু, জাতীয় আন্দোলনের সহিত হিন্দুর সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা, বিষয়টিকে আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছে এবং জাতীয় আন্দোলনকে হিন্দুর সামাজিক আন্দোলনের স্তরে লইয়া আসিয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা (যাহার ভার সমাজ-সংস্কারকদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল), হিন্দুসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে না দিবার জন্য জীবনপণ—মহাত্মাজীকে জাতীয় নেতার আসন হইতে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুনেতার পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে এবং সমগ্র জাতীয় আন্দোলনকেই দুর্ব্বল করিয়াছে। ভেদ সৃষ্টিকারীরা এসকলকে অমোঘ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। অর্থনীতিক সংগ্রামবর্জ্জিত জাতীয়তার আদর্শের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান এইভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি-সংগ্রামে গোড়ার দিকে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে

সচেতন সহযোগিতা থাকিলে বর্তমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এতটা দুর্ভেদ্য হইত না—জাতীয় সংগ্রামকেও এতটা ব্যাহত করিত না।

কিন্তু, জাতীয় আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে যে বিরাট শক্তি বাধামুক্ত হইল, মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা হইতে সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছে এবং বিভিন্ন দলের ভেদ সৃষ্টিকারীদের কার্য্যের ফলে ইহা সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। লীগই হইতেছে ইহার সংহত রূপ। সরকারী নীতির হাতে লীগ যখন অস্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল তখন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ—নানাজনে নানাসময়ে এবং নানাভাবে—লীগ-নেতৃবৃন্দের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টাও আশানুরূপ ফল প্রসব করে নাই বরং জনসাধারণের উপর তাহার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। এই প্রকার চেষ্টার দ্বারা কোনো মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিবার কথাও নহে।

কারণ, জনমতকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই এবং মুসলিম জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলিকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের অবিশ্বাস ও আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। যে সাম্প্রদায়িক নেতাদের সহিত মিটমাটের চেষ্টা হইয়াছে তাঁহারা দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আছে বলিয়া এবং লোকের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে অবিরত নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া তাঁহারা অনেকটা জাগ্রত করিতে পারেন বলিয়া—নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছেন। ইঁহারা ভালভাবেই জানেন যে, ইহাঁদের এই সহজ নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িকতার উপরই নিতান্ত নির্ভরশীল। কাজেই, জনমতের চাপে মীমাংসার কথাবার্তা চালাইতে বাধ্য হইলেও, প্রকৃত মীমাংসার জন্য ইঁহারা কখনই উৎসুক হন নাই এবং কোনো অসম্ভব সর্ত্ত দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

কংগ্রেসের মিলনপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার অন্যতম কারণ—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়া মুসলিম জনসাধারণের মন হইতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিতে পারেন নাই। ভাষা ভূভাগ প্রভৃতির ভিত্তিতে যে সকল স্থানের মুসলমানেরা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে ভেদপ্রয়াসীরা শক্তিহীন হইয়া পড়িতেন। মিলনের প্রস্তাবকে তাঁহাদের পক্ষে ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব হইত। তবুও যে মিটমাটের চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে তাহার মূলে মিলনকামী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের চাপ রহিয়াছে। কিন্তু, জনমতকে সচেতন করিবার চেষ্টা না করায়, ন্যায্য অধিকারগুলি স্বীকৃত না হওয়ায়, নেতারা স্বার্থ ও সুবিধার ভাগ লইয়া কথাবার্ত্তা চালাইবার সুবিধা পাইয়াছেন। ভাগ বাঁটোয়ারার দর-কষাকষি ফাঁসিয়া গিয়াছে এবং ভেদ-সৃষ্টিকারীরা এই অবস্থাকে নিজেদের কাজে লাগাইতে পরিয়াছে।

এই প্রকারের চেষ্টার পরিণতি ব্যর্থতা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে মিলনের ইচ্ছা সব সময়ই আছে। কিন্তু, ইহাকে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে সাহায্য করা হয় নাই। কোন্ দৃঢ় ভিত্তির উপর মিলনের সৌধ রচনা হওয়া উচিত, তাহা না জানিলেও জনসাধারণ মিলন চাহিয়াছেন এবং যখনই মিলনের কথাবার্ত্তা হইয়াছে তখনই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই প্রকারের মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। ভেদপ্রয়াসীরাও এই সুযোগকে বিশেষভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই অপর পক্ষের অন্যায় দাবীকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করিয়াছেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অপর পক্ষকে গালিগালাজ

করিয়াছেন। ইহাতে বিরোধের তীব্রতা ও সম্পর্কের ব্যবধান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু, লীগের সহিত কংগ্রেসের এই মিটমাটের চেষ্টা অতীতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া-যে ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হইবে অথবা এই মিটমাটের-যে প্রয়োজন নাই তাহা মনে করা গুরুতর ভুল হইতেছে। মুসলিম লীগের উদ্ভবের ইতিহাস যাহাই হউক, মুসলিম জনসাধারণের উপর ইহা-যে অপারসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে। লীগের সহিত হিন্দু সভার পার্থক্য এখানেই সুস্পষ্ট। হিন্দু সভার প্রভাব মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠান হইয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় ইহা গণপ্রতিষ্ঠানের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল জাতীয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছে মুসলিম লীগের চিন্তা, ভাবধারা ও নীতির উপর তাহার প্রতিঘাত লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুযোগ প্রত্যাশীরা ক্রমেই প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি কাগজেপত্রে গ্রহণ করিয়া এবং কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া এই নূতন ভাবধারাকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য—কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই নব জাগ্রত, স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনসাধারণের চাপকে তাঁহাদের এড়াইবার উপায় নাই। অন্যপক্ষে লীগের এই গণ-চরিত্রের জন্য, মুসলিম জনসাধারণের উপর তাহার অসামান্য প্রভাবের জন্য মুসলিম লীগকে বাদ দিয়া মুসলিম জনসাধারণের সহিত মিলনের প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যখনই আপোষ হইবে তখনই তাহা জাতীয় মিলনের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হইবে মুসলিম জনসাধারণের উপর

লীগের যে প্রভাব আছে লীগের সহিত কংগ্রেসের মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রভাব, জনসাধারণের মধ্যে মিলনের অন্তরায়রূপে কাজ করিতেছে। কংগ্রেস ও লীগের মিলনের মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কম্যুনিস্টগণ বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের দ্বারা ইহার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিতেছেন। এই জনমতের চাপ মিলনের পথকে প্রশস্ততর করিয়া তুলিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি তৃতীয় পক্ষের অনুগ্রহপুষ্ট সুযোগ-ভোগীরা সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সামন্তপ্রথা ইহাকে লালন করিতেছে এবং জনসাধারণের এই ব্যবধানের উপর নির্ভর করিয়াই সাম্রাজ্যবাদ আত্মরক্ষা করিতেছে : বিশ্বের প্রগতিশীল জনমতকেও হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের কথা বলিয়া ভুল বুঝাইতে পারিতেছে। যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদের আসন পাকা থাকিবে, ততক্ষণ নানা কৃত্রিম উপায়ে সে জনসাধারণের ব্যবধানকে জিয়াইয়া রাখিয়া আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু, আজ যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলন হয়, তবে তাহা জাতির মধ্যে নূতন ঐক্যের প্রেরণার কাজ করিবে, বিপুল শক্তির উদ্বোধন হইবে এবং মিলিত কর্ম্মক্ষেত্রে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রতিদিন জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থের ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারিবে—সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হইবে—ভেদ সৃষ্টিকারীরা দূরে অপসারিত হইবে—জনগণের আচ্ছন্ন দৃষ্টি পরিষ্কৃত হইবে এবং মিথ্যার কুয়াশা বিলীন হইয়া সত্যের আলোক দেখা দিবে।

কংগ্রেসের এতাবত চেষ্টা কেন-যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। মুসলিম-জনসাধারণের মন হইতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবীর ন্যায়সঙ্গত অংশটুকু স্বীকার না করা এবং

জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থকে তুলিয়া ধরিয়া তাহারই ভিত্তিতে মিলন প্রচেষ্টায় অগ্রসর না হওয়া এই ব্যর্থতার একটা প্রধানতম কারণ। আজ যদি তাঁহারা মুসলিম সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকার করিয়া লন এবং জনস্বার্থের ভিত্তিতে মিলনের পথে অগ্রসর হন তবে সেই চেষ্টা সার্থক হইবে। ইহাতে জনগণের মিলিত দাবীর নিকট সাম্রাজ্যবাদ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে, ভেদসৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের ক্রিয়া বিদূরিত হইবে, জনসাধারণের মধ্যে যে প্রকৃত ঐক্যের ধারা রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের বুঝানো সহজ হইবে এবং সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রকৃত ও স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বতন্ত্র হইবার অধিকার থাকিলেও সেই অধিকার কেহ ব্যবহার করিতে চাহিবে না।

জনসাধারণের শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা বিভেদ ও অসারতাকে যেমন জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত মিলনপ্রয়াসী করিয়া তুলিতে হইবে তেমনই মিলনের পথে সর্ব্বপ্রধান বাধা অপসারিত করিবার জন্য—মিলনের অন্ততঃ সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য—কংগ্রেস ও লীগের মিলনের পক্ষে শক্তিশালী ঐক্য-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশময় শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছেন—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলনের জন্য ; এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের চাপে মিলনের পথে লীগ অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। মিলনের সর্ব্বপ্রধান সর্ত্ত হইতেছে পাকিস্তান। কিন্তু এই সর্ত্ত তাহার আদি স্থান হইতে সরিয়া আসিয়াছে ; মুসলিম লীগ ইহার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের ভার মুসলিম জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন। ইহাতে সমগ্র সর্ত্তের চরিত্রগত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্বাধীন বহুজাতিক ভারতীয় রাষ্ট্রে বিশিষ্ট ভূভাগ, অর্থনীতিক অবস্থা ও ভাষাকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রগঠনের কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কাজেই, স্বাতন্ত্র্যের এই ধারণা জাতীয় বিকাশের পথেও কোন বাধার সৃষ্টি করিবে না। আমরা যতই ঘনীভূত ঐক্যের কল্পনা করি না কেন, ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সমগ্র মানবগোষ্ঠী যে কোন সুদূর ভবিষ্যতে এক ভাষাভাষী হইবে, অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অধিবাসীরা একটি মাত্র ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিবে—ইহা আজকার দিনে কল্পনাতীত। এই ভাষা আবার সংস্কৃতির প্রধান বাহন, কাজেই ভাষাগত পার্থক্যের সহিত সংস্কৃতিগত পার্থক্যও জাতিসমূহের মধ্যে কিছু পরিমাণে থাকিবে। যদিও পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে, সংস্কৃতিগত যে পার্থক্যের কথা আমরা কল্পনা করিয়া থাকি তাহার মূলে কোনো সত্য নাই। বিভিন্ন স্তরের অর্থনীতিক বিকাশই সংস্কৃতির মূলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং পার্থক্য যাহা তাহা নিতান্তই উপরিভাগের। কিন্তু, অর্থনীতিক বিকাশ জাতিগুলির মধ্যে একই প্রকারের না হওয়ায় সাংস্কৃতিক স্তরও সকলের সমান নহে। তদ্ব্যতীত উপরিভাগের যে পার্থক্য তাহার উপরও লোকের প্রবল মমতা আছে। এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের তীব্র আগ্রহও আছে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যরক্ষনের প্রতিশ্রুতি লোককে নিশ্চিন্ত করিতে পারিবে এবং বিভেদ সৃষ্টিকারীদের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। স্বতন্ত্র থাকিবার অধিকারের স্বীকৃতি ও সংখ্যালঘুদের মনে যে বিশ্বাস ও ভরসা জাগাইবে তাহা মিলনের পথকে নির্ব্বিঘ্ন করিবে। অর্থনীতিকে বিকাশের মধ্যে একই প্রকারের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই বর্ত্তমানের পার্থক্যকে অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিবে—হয়ত বা একদিন ইহা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া যাইবে।

আজ আসন্ন ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের আশঙ্কা যেমন একদিকে কংগ্রেস ও লীগের মিলনের প্রয়োজনকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি মিলনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ক্ষেত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য মিলন ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। জনগণ ক্রমেই একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে, পরিপূর্ণ ঐক্য ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের সম্মুখে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করা যাইবে না এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে বিশ্বাসভাজন জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক, জনগণের মিলন প্রচেষ্টা ব্যতীত তাহাও লাভ হইবে না। ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশে যে সর্ব্বব্যাপী জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন তাহার জন্য কংগ্রেস ও লীগের মিলনের প্রয়োজনীয়তাও আজ জনগণ ক্রমেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতেছেন।

এইরূপ আন্দোলনের চাপে যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ ও মিলন হয়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্য হইতে পার্থক্যের অনুভূতি বিনষ্ট হইবে, এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জনস্বার্থের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে দেখা যাইবে যে সাম্রাজ্যবাদই নানা উপায়ে প্রসাদভোগীদের সাহায্যে সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর অটুট রাখিয়া এখানে আত্মরক্ষা করিতেছে এবং বিশ্বের জন-মতকে অনুকূলে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের অপসারণ ব্যতীত বিভেদের প্রচীরকে ধূলিসাৎ করা সম্ভব হইবে না। আবার

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি মিলন না হয়—স্বাধীনতা লাভের জন্য যদি উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ একত্র প্রয়াস করিতে না পারেন তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদের অপসারণও সম্ভব হইবে না।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য—

(১) সর্ব্বাগ্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক, এমনকি অপরিহার্য্য। অর্থনীতিক সংগ্রাম বা অন্য যে উপায়ের কথাই দেখা যাউক না কেন—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। অন্যদিকে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মুক্তিপ্রয়াস এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার চেষ্টার মধ্যে যেমন জনসাধারণ স্বার্থের অখণ্ড ঐক্য দেখিতে পাইবে তেমনই অর্থনীতিক সংগ্রাম বিভেদের প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। সুযোগসন্ধানীরাও এই অবস্থায় দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

(২) হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মুসলমান জনসাধারণের উপর লীগের প্রভাবের কথা মনে রাখিতে হইবে। মুসলমানদের মনে যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী জাগিয়াছে, মুসলিম লীগই তাহার প্রতিষ্ঠানিক রূপ ; মুসলিম লীগই তাহার স্বতন্ত্র দাবীর, তাহার স্বতন্ত্র সর্ত্ত রক্ষার অধিকারের কথা বলিয়া আসিয়াছে। সাম্রাজ্যিক স্বার্থের অস্ত্রহিসাবে ইহা করিয়া আসিলেও, এইভাবে লীগ মুসলীম জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া আসিয়াছে মুসলমান জনসাধারণ স্বাধীনতা ও মিলনের জন্য উৎসুক হইলেও, মুসলিম লীগকেই তাহাদের স্বার্থের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। মুসলিম ও কংগ্রেসের মধ্যে মিলন হইলে জনসাধারণের মনের বাধা কাটিয়া যাইবে। মুক্তি-লাভের জন্য দেশরক্ষার জন্য, জনসাধারণকে অন্যায় শোষণের হাত হইতে

উদ্ধার করিবার জন্য যে দেশব্যাপী প্রয়াস আরম্ভ হইবে তাহাই উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধানকে ঘুচাইয়া দিবে।

(৩) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এতদিন মিলনের যে সকল চেষ্টা হইয়াছে তাহার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সহিত সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যলাভের ইচ্ছা জট পাকাইয়া গিয়াছে। ইহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হইলে, সমস্যা অনেক সরল হইয়া যাইবে এবং লীগ প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দাবীর অ-বাস্তব অংশ মুসলিম জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন।

(৪) বর্ত্তমানে মিলনের পক্ষে যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনও তাহা হয় নাই। ফ্যাসিস্ত আক্রমণের আসন্ন বিপদ লোককে মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকই ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে বর্ত্তমান সঙ্কটে একত্র দাঁড়ানো ব্যতীত বাঁচিবার পথ নাই। ফলে নেতৃবৃন্দের উপর এই জাগ্রত জনমতের চাপ পড়িয়াছে। সুবিধার ভাগ লইয়া দর কষাকষির সুযোগও এখন নাই। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথের অন্যান্য বাধা অপসারিত হইয়া এখন শুধু পাকিস্তানের দাবীতেই আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু, জনমতের দাবী এক্ষেত্রেও মাথা তুলিয়াছে এবং পাকিস্তান পরিকল্পনার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্তের ভার মুসলিম জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিতে লীগ সম্মত হইয়াছেন। এই সময় বিশিষ্ট জাতিগুলির স্বতন্ত্র হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে জিন্নাজী পরিকল্পিত পাকিস্তানের প্রস্তাবের আর কোনো শক্তি থাকিবে না। একই ঐতিহাসিক সূত্রে আবদ্ধ, একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিক জীবন ও মানসিক গঠনে সংযুক্ত বিভিন্ন জাতির -

বাসভূমির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে, কংগ্রেস ও লীগের মিলনের পথে জিন্নাজীর পাকিস্তানের প্রস্তাব বাধা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। বিভিন্ন জাতির পৃথক হইবার অধিকার স্বীকার করিলে স্বাধীন ভারতে তাহাদের নিপীড়ন হইতে মুক্তিদান ও সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে।

(৫) কংগ্রেস এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পাকিস্তান যে বিচ্ছিন্নতার বিষ ছড়াইতেছে তাহা প্রতিরোধ করা হইবে, কারণ পাকিস্তান দাবীর ভিতর যাহা ন্যায্য, সোজাসুজি তাহাই ইহাতে স্বীকার করা হইবে। অন্ধ্র, কানাড়ী, মারাঠী, বাঙালী প্রভৃতি জাতির মতো, উপরি লিখিত জাতির সংজ্ঞা অনুযায়ী যেখানে মুসলমানরা জাতি বলিয়া গণ্য হইবে সেখানেই তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার থাকিবে। অন্যান্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিতর যেখানে মুসলমানরা এখানে-ওখানে ছড়ানো থাকিবে সেখানে তাহাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ভাষার অধিকারের গ্যারান্টি থাকিবে। জাগ্রত মুসলমান জনগণের দাবী এই ব্যবস্থায় পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিবে। স্বাধীন ভারতে নিপীড়ন হইতে মুক্তি ও সম্পূর্ণ সমান অধিকারের গ্যারান্টি তাহারা পাইবে। জিন্নাজীর পাকিস্তানের দাবী মুসলিম জনগণের মাঝে ভেদনীতি ঢুকাইয়া এবং কংগ্রেস ও লীগের ভিতর (হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণের ভিতর) বিভেদ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে বিশিষ্ট জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় অবিশ্বাস ও ভয় বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহার সহিত ব্যবধানও বাড়িয়া যাইতেছে।

(৬) কিন্তু, এজন্য নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভর করিলে পূর্ব্বের ভুল করা হইবে। জনসাধারণের মধ্যে মিলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে হইবে—সংখ্যালঘু জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি যে

পাকিস্তান দাবীর সারবস্তু, জনসাধারণের স্বার্থ-যে এক ও অখণ্ড, আমাদের অনেক ভয়-যে মিথ্যা ও অলীক,—দেশরক্ষার প্রশ্ন-যে আজ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, নেতৃবৃন্দকে-যে জাতির ভাগ্য লইয়া জুয়াখেলা করিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না—সে কথা জনসাধারণকে বিশেষ ভাবে বুঝাইতে হইবে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিবে তাহাতেও প্রাত্যহিক জীবযাত্রায় জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থের অখণ্ডতা বুঝিতে পারিবেন। এইভাবে কংগ্রেস ও লীগের মিলনের জন্য প্রবল জনমতের সৃষ্টি হইবে এবং নেতৃবৃন্দকে হয় এই দাবী মানিয়া লইতে হইবে অথবা জনগণের আস্থা হারাইতে হইবে।

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলন সম্পাদিত হইলে তাহা জাতীয় মিলনের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণের মন হইতে স্বাতন্ত্র্যের ভাব ও ইচ্ছা তিরোহিত হইবে। ইহার পর অর্থনৈতিক সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি ও দেশরক্ষার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া জনসাধারণ ঐক্যের সত্যতা সার্থকতা এবং অনৈক্যের ধ্বনির অলীকতা ও অসারতা বুঝিতে পারিবেন।

এই বন্ধুর, দীর্ঘ ও দুঃসাহসিক পথে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সূত্র সন্ধান করিতে হইবে। জাতীয় স্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে জনমত জাগ্রত হইতেছে ; জনস্বার্থের ও জাতীয়মুক্তির প্রয়োজনে এই সচেতন প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে—ইহা অবশ্যম্ভাবী।